DECEMBER 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম কুাইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

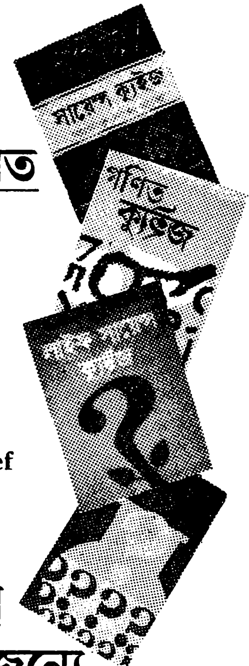

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—The Statesman

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী কুাইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ কুাইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স কুাইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স কুাইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত কুাইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স কুাইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সপ্তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা
ডিসেম্বর ঃ 1987

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ মৃত সাগর কি সত্যিই মৃত ? ॥ সমরজিৎ কর 7

পড়াশোনা ঃ কার্বন ॥ অমরনাথ রায় 15 ঃ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ ॥ তারক মোহন দাস ও সীমা সেন 17 ঃ গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. প্রসঙ্গে ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 52

বিশেষ রচনা ঃ সমুদ্রের সম্পদ ॥ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায় 27

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা ঃ বিজ্ঞান ভাবনায় সুকুমার ॥ কার্তিক ঘোষ 9 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 16 ঃ লিমুরিয়া-মনুষ্যজাতির উদ্ভবস্থল ॥ সুশান্ত সাহা 53

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ বরুণ মণ্ডল 18 ঃ বিজ্ঞানীদের টুকিটাকি ॥ অমরনাথ রায় 42 ঃ এডিসনের ভাস্বরদ্বীপ ঃ প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায় 39

ছড়া ঃ মলাট ছুঁয়ে ॥ প্রণতি মজুমদার 10

শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা ঃ দিনকানা ॥ দিলীপ মালাকার 54 ঃ অ্যান্টি-বায়োটিক্স্ ॥ সুকন্যা ভট্টাচার্য 47

ইলেকট্রনিক্স-এর কলাকৌশল ঃ ইলেক্ট্রনিকস্ এর কথা ঃ পাঁচ বিপ্লব ব্যানার্জী 19

ধারাবাহিক রচনা ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 48

বিজ্ঞানের ডায়েরী ঃ অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ॥ বিমান বসু 31

জীবজন্তু ও গাছপালা ঃ বিচিত্র প্রাণী ॥ আর্মাডিলো ॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ 22

প্রতিযোগিতামূলক রচনা ঃ ছন্দোময় মণ্ডল 6 ঃ দেবেশ দাস 63

ছবিতে গল্প ও রঙিন ফিচার ঃ জানা অজানার খবর ॥ রেবতী ভূষণ ॥ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার ও অনিল কর্মকার 12 ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 14 ঃ মণি কুন্তলা ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস ॥ অনিল কর্মকার ও গৌতম কর্মকার 43

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের খবর ঃ শারদীয় ও মাসিক প্রতিযোগিতার সফল উত্তরদাতাদের নাম ॥ 59

শব্দকূট ॥ চঞ্চল অধিকারী 56 ঃ আইকিউ টেস্ট 56 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট 58

বলতে পারো কেন ? সুধাংশু পাত্র 64 ॥ বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 66

শারদীয় প্রতিযোগিতার সমাধান 57 ঃ মাসিক প্রতিযোগিতার সমাধান 56

ঘুমপাড়ানি সঙ্গীত ॥ অপরাজিত বসু 62 ঃ মাল্টিপারপাস এলার্ম ॥ শঙ্কর প্রসাদ দেবনাথ 62

প্রচ্ছদ ঃ সমীর মণ্ডল ॥ **অন্যান্য ছবি ঃ** অলয় ঘোষাল, সুবোধ মণ্ডল

ভ্রম সংশোধন ঃ 1987-র অক্টোবর নভেম্বর সংখ্যায় দেবকুমার রায়ের 'সাউণ্ড মাস্টার' নামে মডেলটিতে 100 M. F. D.-র জায়গায় 1000 M. F. D. হবে।

আগামী সংখ্যায়

বিশেষ রচনা
মহাবিশ্বের রহস্য
লিখবেন ঃ
প্রসেনজিৎ কর
শঙ্কর ঘটক

প্রধান সম্পাদক ॥ **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক ॥ **রবীন বল**
সহ সম্পাদক ॥ **জয়ন্ত দত্ত**

ইলেকট্রনিক্স

আগস্ট '87 সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিপ্লব ব্যানার্জী 'ইলেকট্রনিক্সের কথায় লিখেছেন 'প্রায় সম্পূর্ণ ...P-type ও N-type crystal.' কিন্তু কেন ও কিভাবে P এবং N-type crystal তৈরি হয় তা তিনি বিশদভাবে লেখেন নি। আমি এ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করলাম।

জার্মেনিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা 32টি ইলেকট্রনগুলি চারটি কক্ষে যথাক্রমে 2, 8, 18, 4 হিসাবে সাজান থাকে। আবার ফসফরাস পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা 15। ইলেকট্রনগুলি তিনটি কক্ষে যথাক্রমে 2, 8, 5 হিসাবে থাকে। এখন জার্মেনিয়ামের সঙ্গে ফসফরাস মিশালে জার্মেনিয়ামের valency bond-এর 4টি ও ফসফরাসের valency bond-এর 5টি ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে মোট 9টি ইলেকট্রন হয়। কিন্তু যেহেতু পরমাণুর শেষ কক্ষে 8টির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, সেহেতু অবশিষ্ট ইলেকট্রনটি আরেকটি কক্ষে স্থান নেয়। ইলেকট্রনের charge Negative বলে এইভাবে প্রস্তুত crystal কে N-type crystal বলে।

আবার বিপরীতভাবে বোরন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির ভ্যালেন্সি বণ্ডে 3টি ইলেকট্রন থাকে সুতরাং জার্মেনিয়ামের সঙ্গে এদের মিশালে যে crystal তৈরি হয় তার শেষ কক্ষে 7টি ইলেকট্রন থাকবে। বাইরের কক্ষে 8টি ইলেকট্রনের জায়গায় 7টি ইলেকট্রন থাকায় সেখানে একটি ইলেকট্রন কম হবে বা একটি হোল (hole)-এর সৃষ্টি হবে। hole-এর charge positive হওয়ায় এই ধরনের crystal-কে P-type crystal বলে। এইভাবে P-type ও N-type crystal তৈরি হয়।

প্রসাদ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র পল্লী, রায়গঞ্জ পশ্চিম-দিনাজপুর।

বৃহত্তম কাব্যগ্রন্থ

জানুয়ারি 1987 সংখ্যা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এ সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট (পৃষ্ঠা 58)-এর 3নং প্রশ্ন 'বিশ্বের দীর্ঘতম কাব্য গ্রন্থটির নাম কি?' এর সমাধান মার্চ 1987 সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে 'মহাভারত' (পৃষ্ঠা 14)।

হ্যাঁ, আমরাও জানতাম যে বিশ্বের দীর্ঘতম কাব্যগ্রন্থ মহাভারত।

কিন্তু কলকাতা থেকে প্রকাশিত কমল লালকমল' ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আগস্ট 1986-এর 17 পৃষ্ঠায় 'সব চাইতে বড় মহাকাব্যের খোঁজে' শিরোনামে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর দীর্ঘতম মহাকাব্য-এর নাম 'গেসার'।

এখানে উক্ত পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি করলাম—"না, রামায়ণ বা মহাভারত নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ মহাকাব্যের নাম 'গেসার', তা রচিত হয়েছিল তিব্বতে, তার প্রথম প্রকাশ আজ থেকে ন'শো বছর আগে। এতে বলা আছে দেবতার মত শক্তিধর এক মহাবীর শৌর্য-বীর্যের গল্প দৈত্যদানব ও অপদেবতাদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাই যার কাজ। 'গেসারে'র পুঁথিগুলো হাল আমলে প্রায় সবই হারিয়ে যেতে বসেছিল, অল্প কিছু কবি শুধু তাঁদের গলার গানে ধরে রেখেছিলেন 'গেসারে'র কাহিনী। কিন্তু বর্তমান চীনা পণ্ডিতরা কঠিন পরিশ্রম করে এই হারিয়ে-যাওয়া মহাকাব্যটির প্রায় পুরোটাই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। শিগগিরই তাঁরা বই আকারে এটি বার করবেন। এতে থাকবে ১২০টি কাহিনীর মালা। যা লিখতে লাগবে দশ লক্ষ লাইন অর্থাৎ এক কোটি শব্দ।

সমীর কুমার সূত্রধর, শান্তিধাম কালীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, নিউকলোনি বঙাইগাঁও, আসাম-783380।

সূর্যের ব্যাস

আমি আপনাদের কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত 'জুন' 987 সংখ্যায় মৃন্ময়ী দাস মহাশয়ার 'নতুন সুপারনোভা' প্রবন্ধটি খুব ভালো লাগলো। সেই সঙ্গে ঐ প্রবন্ধের শেষে 'জেনে রাখো' অংশটিও খুব ভালো লাগলো। কিন্তু ঐ অংশটিতে লেখিকা 'অ্যাসটরয়েড;-এর কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন 'সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণরত প্রায় 1500 টি ছোট গ্রহের একটি বন্ধনী আছে যার ব্যাস 300 মাইলের মত। বক্তব্যটি কি নির্ভুল? যেখানে সূর্যের ব্যাসই 300 মাইলের অনেক বেশি সেখানে তার চারিদিকে পরিক্রমণরত গ্রহগুলির দ্বারা সৃষ্ট বন্ধনীর ব্যাস 300 মাইল হওয়া কি সম্ভব?

পলাশ বরণ দাস, প্রযত্নে অচিন্ত্য কুমার দাস, কায়েমগেড়িয়া, মেদিনীপুর।

আবিষ্কারের গল্প

আমি আপনাদের প্রকাশিত 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। 1987 এর মার্চ সংখ্যাটি পড়তে কিছুটা দেরী হয়ে যায়। বই-এর শেষের দিকে 'আবিষ্কারের গল্প' চেপ্টারে অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর লেখা 'কাইনেটোফোন আবিষ্কার' পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখলাম, 'টেলিফোন যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই এডিসন ...।'

বলা বাহুল্য এখানে 'টেলিফোন' এর জায়গায় সিনেমা হবে নতুবা 'টেলিফোন' আগে থাকলে পরে 'এডিসন' এর জায়গায় গ্রাহামবেল হবে। আমার অনুমান ঠিক নয় কি?

অলকেশ ঘোষ, পলাশী, হুগলী।

জল কিভাবে আগুন নেভায়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের জুলাই '87 সংখ্যায় 'বিজ্ঞানের খবর' বিভাগে শীত ঘুম পাড়ানি শিরোনামে মাননীয় অমিত চক্রবর্তী শীত ঘুম বা হাইবারনেশন সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন—তাঁকে ধন্যবাদ। তিনি বলতে ভুলেছেন হাইবারনেশনের উপকারিতা দীর্ঘ মহাকাশ যাত্রার সময় নভোচারীদের আয়ু রক্ষায় যা বিশেষ দরকারী।

দ্বিতীয়তঃ চিঠিপত্র বিভাগে সুদীপ রঞ্জন বিশ্বাস 'জলে আগুন নেভে কেন' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছেন তিনি অবৈজ্ঞানিকভাবে বলেছেন 'জলও এক প্রকার ছাই'; কিন্তু জল হল হাইড্রোজেনের অক্সাইড, আরেক উদাহরণ 'যে সব জিনিসে কার্বন আছে, সেগুলোও কেবল পোড়ে', অথচ পরেই জানিয়েছেন মৌলিক গ্যাস 'হাইড্রোজেন জ্বলে' অক্সিজেনে।

আসল কথা, জল থেকে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প বাতাসের আর আগুনের মাঝে একটি বাধা সৃষ্টি করে যা অক্সিজেন প্রবাহ বন্ধ করে আগুন নেভায়, এটি দাহ্যপদার্থের তাপমাত্রাও কমিয়ে দেয়।

আশিস মান্না, স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ বয়েজ হোস্টেল, কলিকাতা-14

জল কিভাবে আগুন নেভায়

গত July '87-এর কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে 'চিঠিপত্র' বিভাগে সুদীপরঞ্জন বিশ্বাস-এর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে শ্রীবিশ্বাস শ্রীসাধন কুমার গিরি-র লেখা 'আগুনের কথা' প্রবন্ধের একটি ভুলের উল্লেখ করে তা সংশোধন করতে চেয়েছেন। শ্রীবিশ্বাসের অভিযোগ, শ্রীগিরি স্পষ্টভাবে লেখেন নি, জল কেন আগুন নেভায়। তাই শ্রীবিশ্বাস উক্ত চিঠিতে জলের আগুন নেভানোর পেছনে যে কারণটি রয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রীবিশ্বাসের উল্লেখ করা কারণগুলি যুক্তিযুক্ত হলেও, তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ দিয়ে গেছেন। আগুন যে জল প্রয়োগে নিভে যায়, তার উল্লেখযোগ্য কারণ হল জলের আপেক্ষিক তাপ। অন্যান্য সমস্ত বস্তুর মধ্যে জলের আপেক্ষিক তাপ সর্বাধিক, 1. এই কারণেই আগুনে জল প্রয়োগ করলে, জলের আপেক্ষিক তাপ অধিক হওয়ায়, জল আগুন থেকে অধিক পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে নেয়। ক্যালরিমিতির মূল নীতি অনুযায়ী, গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ। সুতরাং জল আগুন থেকে যে পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে, আগুন সমপরিমাণে তাপ বর্জন করে। ফলে সহজেই আগুন নিভে যায়।

অনিন্দ্য দে, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি এক্স-পেরিমেন্টাল হাইস্কুল, কল্যাণী, নদীয়া।

আগামী সংখ্যা থেকে
কমপিউটারের কলা-কৌশল

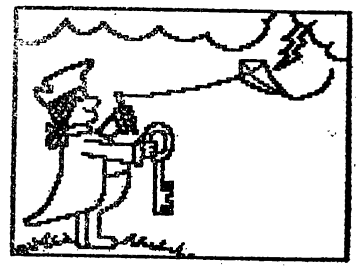

কমপিউটার কি শুধুই একটি যন্ত্র-গণক? হ্যাঁ, প্রথম যখন কমপিউটার তৈরি হয়েছিল তা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি অঙ্ক কষার যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এখন?

এখন আর 'কমপিউটার' শব্দটি অঙ্ক কষার যন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর আকার, আকৃতি, কর্মক্ষমতা, দাম প্রয়োজনীয়তা এত বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ যে, ভাবলে অবাক হতে হয়। এখন আর শুধু হিসেব কষা নয়, কমপিউটার ছবি আঁকতে পারে, গান গাইতে পারে, ভি. ডি. ও. গেম মেলাতে পারে বরঞ্চ প্রশ্ন করা যেতে পারে কমপিউটার কি না পারে?

তুমি কমপিউটারকে কিভাবে ব্যবহার করবে তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ তোমার ওপরে। কমপিউটার তোমার সেক্রেটারীও হতে পারে। আবার হতে পারে তোমার প্রিয় বন্ধুও।

আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার অন্যতম অবদান কমপিউটারের কলাকৌশল নিয়ে আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক রচনা লিখবেন সৌম্য মিত্র।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়
1988 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও প্রস্তুতি

প্রকাশিত হবে।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত সপ্তম/অষ্টম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

কুসংস্কার / ছন্দোময় মণ্ডল

বহুদিন ধরে চলে আসা প্রথাই হল সংস্কার, আর যা মানুষের জীবনধারার পক্ষে বাধাস্বরূপ তাই হল কুসংস্কার। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানবজীবনে ছিল না কোনো সংস্কার। তাই মানুষও প্রয়োজন মত কাজ ও আচার-আচরণ করত। কিন্তু রহস্যময়ী প্রকৃতির মায়া যবনিকার অন্তরাল থেকে বিপদের পর বিপদ আসতে লাগল প্রতি পদে পদে—ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দাবানল, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপাতের রূপ ধরে। এসবের ত্রুটিপূর্ণ বোধ, ব্যাখ্যা ও ভয় থেকেই জন্ম নিল কুসংস্কার—যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রকাশ।

কালের রথচক্রে সভ্যতা এগোতে থাকলে মানুষের আয়ত্তে আসে আগুনের ব্যবহার, বনানীর সাথে সাথে মানুষের অনাগত বংশপরম্পরার ভবিষ্যৎও হয়ে উঠে উদ্ভাসিত। মানবমন হয় অনুসন্ধিৎসু, কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে উৎসুক। জ্ঞান ও অজ্ঞতার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে মানুষ প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে প্রবেশ করে আধুনিক আলোকোজ্জ্বল যুগে, লাভ করে 'কুসংস্কার সংস্কারে' ব্রতী হওয়ার মনোবল।

ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে নানাধরনের কুসংস্কার প্রচলিত আছে। যীশুখ্রীস্ট তাঁর শেষ ভোজসভায় ১২ জন অনুগামীসহ ভোজন করায় ১৩ সংখ্যাটি আজও বিশ্বের সর্বত্র অমঙ্গলজনক মনে করা হয়। এছাড়া, পিছু-ডাকা, হাঁচি, টিকটিকির ডাক, নিশিডাকা ইত্যাদি নানাবিধ কুসংস্কার থেকেও মানবমন মুক্ত নয়। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুসংস্কার কয়েকজন প্রখ্যাত মনীষীর আন্তরিক চেষ্টায় লুপ্ত হলেও জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ ও পণপ্রথার ন্যায় কুপ্রথা আজও বহুল প্রচলিত।

প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল গলা-কাটা রাহু-দৈত্যের চন্দ্রভক্ষণের ফলেই নাকি চন্দ্রগ্রহণ হয় আর তাকে রাহুমুক্ত করার জন্যই কাঁসর ইত্যাদি বাজানো বিধান। আবার, মানুষের বিজ্ঞান-সম্পর্কিত ভুল ধারণা, যেমন—পৃথিবী চ্যাপ্টা, সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত ইত্যাদির বিরুদ্ধে গ্যালিলিও, কোপারনিকাস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আলোড়ন তোলেন। কিন্তু সেদিন কুসংস্কারের জন্মদাতা "অজ্ঞতা" এবং তার "পালিকামাতা" সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী ধর্মযাজকদের চাপে গ্যালিলিওর কণ্ঠরোধ হয়। পরে অবশ্য গ্যালিলিওর বিচারের উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে পোপ ২য় জন পলের বৈজ্ঞানিক, ধর্মযাজক এবং ঐতিহাসিকদের নিয়ে গঠিত কমিশন রায় দিয়েছে—"গ্যালিলিওর কণ্ঠরোধ করে চার্চ সেদিন ভুল করেছিল।"

খেলাধূলার ক্ষেত্রেও অনেকে তুক-তাকে, কেউবা "Super-natural-power"-এ বিশ্বাসী। আফ্রিকার অধিকাংশ ফুটবল দলেই রয়েছে নিজস্ব "Witch-doctor". এমনকি ১৯৮২ সালে স্পেনে বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ক্যামেরুনের জাতীয় দল "Witch-doctor" নিয়ে অংশগ্রহণ করায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির দুর্বার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কুসংস্কারকে বিতাড়িত করে জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেতে হলে প্রথমেই দরকার উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষা। আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর যুগে মানুষ যদি সবকিছু যুক্তিতর্কের মাধ্যমে গ্রহণ করে কুসংস্কারকে বর্জন করে, তবেই একদিন প্রতিভাত হবে সর্বগ্লানি ভ্রান্ত ধারণামুক্ত উজ্জ্বলতম দিন। তাই বিজ্ঞানকে গুরুর আসনে বসিয়ে উচ্চারিত হোক—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

বিজ্ঞানের কাজল কাঠির ছোঁয়ায় কুসংস্কার—অন্ধমানুষের দৃষ্টি—জ্ঞানদৃষ্টি হোক উন্মোচিত, কুসংস্কারের জাল থেকে সে হোক মুক্ত।

প্রযত্নে, **প্রফেসর বারিদ বরণ মণ্ডল**, বি-15/77, লেক প্লেস, কল্যাণী, নদীয়া, PIN-741235।

'খেলার টুকরো খবর'

ফিচারটি আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে

মৃত সাগর কি সত্যিই মৃত ?

সমরজিৎ কর

শেষ স্টেশনে পৌঁছানর পর রেলগাড়ি যেমন আর সামনে এগোয় না, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। বলতে পারো, আসলে সেটি একটি হ্রদ। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'টার্মিনাল লেক'। বাংলায় বলতে পারো 'প্রান্তিক হ্রদ'। উত্তরে নদী-নালা। তাদের জল পাহাড়, মাটি এবং বালির মধ্যে মিশে থাকা লবন বয়ে নিয়ে এগিয়ে আসে দক্ষিণ দিক বরাবর। তারপর জরডন গ্রস্ত উপত্যকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই হ্রদে এসে উপস্থিত হয়। সেই প্রান্তিক হ্রদ। সেখানে যার শেষযাত্রা। এইভাবেই চলেছে হাজার হাজার বছর।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখ। হাজার হাজার বছর ধরে জল এসে পড়ছে সেই হ্রদে। তাতে থাকে যৎসামান্য লবন। সেখানকার আবহাওয়া শুকনো। সারা বছর প্রচণ্ড রোদ। ফলে বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি। বছরে তিনশ দিনেরও বেশি আকাশ থাকে পরিষ্কার, এক টুকরো মেঘেরও দেখা মেলে না। তাই বাষ্পীভবন আরো বেশি। তাই অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই, বিশেষ এই হ্রদটির জলে লবনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। সাগর-মহাসাগরের এক কিলোগ্রাম জলে গড়ে লবন থাকে 35 গ্রামের মত। আর এখানে, এই হ্রদের জলে সেই লবনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এখন প্রতি কিলোগ্রামে 280 গ্রাম। আরো একটি মজার ব্যাপার। পৃথিবীর আর কোথাও সমুদ্র তলের এত নিচে আর কোন জলাশয় নেই। অন্যান্য সাগর এবং মহাসাগরের উপরের তলের তুলনায় এখানকার উপরের জলের তল 400 মিটার নিচে অবস্থান করছে। হ্রদটির গভীরতা 320 মিটার। এত বেশি লবন থাকার দরুন জীববিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন, এখানকার জলে কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। শৈবাল অথবা ব্যাকটেরিয়ার মত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পক্ষেও নয়। জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই ভেবে তাই এর নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'মৃত সাগর'। ইংরেজীতে বলা হয় 'ডেড সী'। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই মৃত সাগরেও রয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব। মৃত সাগর সত্যিই মৃত নয়।

এই প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথাও তোমাদের বলে রাখি! ডেড সী'র জলস্তরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের অংশকে বলা হয় 'ফসিল ওয়াটার' বা জীবাশ্ম জল। এই স্তরের বয়েস হাজার হাজার বছর। ভূপৃষ্ঠ থেকে লবন এবং নানা রকম খনিজ সামগ্রী জলে দ্রবীভূত হয়ে এই সমুদ্রে এসে পড়ে। পশ্চিমে জুডিন পর্বতমালা, পুবে মোয়ার পর্বতমালা। যেন দুই প্রাচীর। প্রাচীর দুটি পেরিয়ে বর্ষার মেঘ এ অঞ্চলে আসতে পারে না। এলেও কদাচিৎ। ফলে এখানে বৃষ্টি নেই বললেই চলে। গড় বৃষ্টিপাত 50 থেকে 75 মিলিমিটার। সারা বছর দৈনিক তাপমাত্রা দাঁড়ায় 30 থেকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্রীষ্মে কখনো কখনো সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে 54 ডিগ্রি। এমন চরম আবহাওয়া সম্পন্ন

আগামী সংখ্যা থেকে

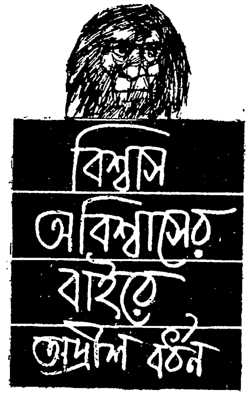

পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সিদ্ধান্ত। এইভাবেই বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বুকে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তবুও প্রতিদিন নানা ঘটনা এমন ঘটে যার সঠিক ব্যাখ্যা কিছুতেই দেওয়া যায় না। ফলে রহস্যের অন্তরালেই থেকে যায় সেই সব ঘটনা। অদ্রীশ বর্ধন তাঁর সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে আমাদের ধারাবাহিক ভাবে শোনাবেন সেই সব অব্যাখ্যাত রোমাঞ্চকর কাহিনী। যে সব কাহিনী বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখায় দিশেহারা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর্ব তো শুরু হয়েছে অনেক আগেই এবং বৈজ্ঞানিক সমর্থন না পেলে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রকৃতির সেই অজানা রহস্যগুলিই বা কি— যার সমাধান আজও বিজ্ঞানীরা করতে পারেন নি।

পরিবেশে জলের বাষ্পীভবন দ্রুত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। জলে অতিরিক্ত লবন দ্রবীভূত হওয়ার ফলে এই সমুদ্রের উপরের তলের বাষ্পচাপ কম হয়। যার দরুন সাধারণ জল এমন পরিবেশে যতটা দ্রুত বাষ্পীভূত হতে পারত, ততটা হয় না। তবু নতুন জল, যা বৃষ্টি অথবা নদীর মাধ্যমে আসার কথা, তার পরিমাণ কম বলে বাষ্পীভবনের মাত্রা যেটুকু থাকে সেটাই যথেষ্ট। বছরের পর বছর ধরে বাষ্পীভবন হওয়ার ফলে জলে লবনের মাত্রা বাড়ে। সেই জন্যই হাজার হাজার বছর ধরে নিচের স্তরে জমা হয়ে রয়েছে, জীবাশ্ম জল হিসেবে। জীবাশ্ম জলের উপরের অংশে যে জলস্তর রয়েছে, তা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। তার সঙ্গে নিচের স্তরের জল খুব একটা মিশ খায় না। আরো একটি কথা। ডেড সী দেখায় দুটি গামলার মত একটি উত্তরে, একটি দক্ষিণে। গামলা দুটি পৃথক করে অবস্থান করছে একটি উপদ্বীপ। নাম 'এল লিসান'। এটি আরবী ভাষা। যার অর্থ 'জিহ্বা'।

ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, কুড়ি থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে ডেড সী'র সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ ছিল। তখন এখানকার জলে বাস করত নানান জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক চ্যুতির দরুন প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়।

1970 সাল থেকে এই মৃত সাগরটি নিয়ে ব্যাপক ভাবে গবেষণা শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। বাইরে থেকে জল প্রবাহিত করে এখানকার জলে মেশান হচ্ছে। দেখা গেছে এখানকার প্রাচীন জলের মধ্যে রয়েছে 1 শতাংশ পটাশ অথবা পটাশিয়াম ক্লোরাইড, 8 শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড, 13 শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং 0·3 শতাংশ ব্রোমিন। এ ছাড়া জলের নিচে ভূস্তরে জমে রয়েছে প্রচুর জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট। এখানকার জল থেকে পটাশ সংগ্রহ করে সার উৎপাদনেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু গোড়ায় যে কথা বলেছিলাম, মৃত সাগর মৃত নয়। ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে 1936-এর পর। ওই বছর ইজ্রায়েলের সিয়েফ ইনসটিটিউটের বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন এলজারি-ভোলকানি এখানকার জলে আবিষ্কার করেন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। ওই সময় এক প্রজাতির শৈবালও এখানে তিনি লক্ষ করেন। সবুজ রঙের শৈবাল। নাম দুনালিল্লা (Dunaliella)। এই শৈবাল মিষ্টি এবং সমুদ্রের জলে পাওয়া গেলেও, এই প্রথম বোঝা গেল মৃত সাগরের মত

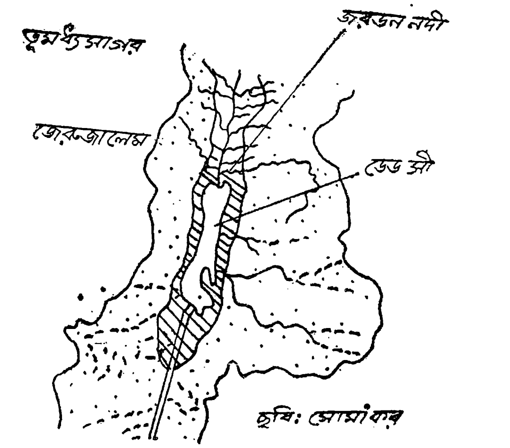

অতিরিক্ত লবনাক্ত জলেও তারা অভিযোজনের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে। 1970-এর আগে পর্যন্ত 50 মিটার গভীরতার নিচে কোন ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় নি। 100 মিটারের নিচে পাওয়া যায় নি দুনালিল্লা। 1970-এর পর নিয়মিত মিষ্টি জল প্রবাহিত করার দরুন মৃত সাগরে লবন জলের ঘনত্ব কমে গেছে। ফলে সেই জলের উপরি তলে এখন প্রতি মিলিমিটার স্থানে জন্মাচ্ছে 40,0..0 এর মত দুনালিল্লা শৈবাল কোষ।

বুঝতেই পারছ, যে জল এত লবন,, সেখানে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাদের শারীরবৃত্তীয় চরিত্রও হবে ভিন্ন রকমের। এদের কোষে থাকে অতিরিক্ত মাত্রায় পটাশিয়াম। যে সব ব্যাকটেরিয়া গভীর অঞ্চলে বাস করে তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে অক্সিজেন কাজে লাগায় না। 1979-এর পর ক্রমান্বয়ে জল সরবরাহের দরুন, এখানকার জলে লবনের মাত্রা কিছুটা কমেছে- প্রতি কিলোগ্রাম জলে 150 গ্রামেরও কম। এর ফলে সেখানে ব্যাকটেরিয়াও বেড়েছে এখন। উপরের তলের প্রতি মিলিমিটারে এখন বাস করছে 1 কোটি 90 লক্ষের মত ব্যাকটেরিয়া। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন ভবিষ্যতে এখানকার জলে হয়ত এমন ধরনের জীবাণু উৎপাদন করা যাবে যাদের ধাতু নিষ্কাশনে কাজে লাগান যাবে। কাজে লাগান যাবে সৌরশক্তি ব্যবহারেরও। যেমন ধরো, লোহিত সাগরের সেই 'রেড পার্পল ব্যাকটেরিয়া'। এই ব্যাকটেরিয়া সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারে। এমন ধরনের ব্যাকটেরিয়া মৃত সাগরেও যাতে চাষ করা যায় সে ব্যাপারেও চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

বিজ্ঞান ভাবনায় সুকুমার

কার্তিক ঘোষ

ছিল রুমাল। হয়ে গেল একটা বেড়াল। মুশকিল বললে হবে না। হ য ব র ল' তেই পড়েছি, মুশকিল আবার কি? 'ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি প্যাঁক প্যেঁকে হাঁস। এতো হামেশাই হচ্ছে।'

আসলে খেয়াল রসের লেখায়, উদ্ভট কল্পনার মধ্যেও বিজ্ঞানের মিশেল দিয়েছেন সুকুমার রায়। আপেক্ষিকতত্ত্বের জগতে প্রতি মুহূর্তেই ঘটে এই রকম রূপান্তর।

যেমন রুমালটা ছিল আসলে একটি ছোট্ট পদার্থ। মানে বস্তু। আবার সেই রুমালটাই চোখের পলকে পালটে যায়। হয়ে ওঠে মোটাসোটা লাল বেড়াল। একটু পরেই আবার চমকে উঠতে হয় সেই তত্ত্বেরই গাণিতিক রশ্মিচ্ছটায়। যেখানে আছে, 'আমাকে বেড়াল বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো।'

বুঝতেই পারছি, বস্তু আর শক্তির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য বলে কিছু নেই, ঐটুকু লেখায় সেই কথাই প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞান-মনস্ক সুকুমার রায়ের কলমে কখনোই ঝলসে ওঠেনি শুধু খেয়াল রসের কবিতা কিম্বা আজগুবি কল্পনা ঘেঁসা গল্প।

রসায়ন আর পদার্থবিদ্যায় ডবল অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পাশ করেছিলেন সুকুমার। সেটা 1906 সাল। তারও প্রায় সাত বছর পরে বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন তিনি। তখন তাঁর সোনার কলমে অদ্ভুত খেয়াল রসের সঙ্গে মিশেল হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞান চেতনার সুবাস। সেই সুগন্ধেই একদিন আমোদিত হয়েছিল বাঙালি পাঠক। তখনও বিজ্ঞান-সাহিত্য আজকের এই কৈশোরের গণ্ডিতে পা দেয়নি। 'আবোল-তাবোল'-এর প্রথম কবিতা 'খিচুড়ি'তেই সুকুমার রায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এক বিচিত্র শল্য-চিকিৎসার আশ্চর্য পদ্ধতির সঙ্গে। যেখানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চেষ্টায় হাঁস আর সজারুকে একদিন 'হাঁসজারু' করা হবে।

আজকেও এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে সেই অসম্ভব কল্পনাও সম্ভব হচ্ছে। এখন তো অঙ্গহীন শরীরে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে দেওয়াটা কিছুই নয়। প্লাস্টিক আর ধাতুর তৈরি হৃদপিণ্ড তো আজকের অনেক মানুষের বুকের তলায় ধুকধুক করছে দিব্যি। হার্ট আর কিডনি বদলে দিতে আজকে আর কতটুকুই বা ভাবতে হয় বিজ্ঞানকে?

ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান যেন ছিল সুকুমারের বন্ধু। বাড়িতেও ছিল বিজ্ঞানের অনুকূল পরিবেশ। বাবা উপেন্দ্র-কিশোর শুধু যে সঙ্গীত, শিশুসাহিত্যরচনা বা ছবি আঁকাতেই সময় দিতেন তাই নয়, যন্ত্রকুশলী হিসাবেও তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। সেই যুগেই হাফটোন ছবি ছাপার ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় লাভ করেছিলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ব্লক তৈরির ছবি তোলা নিয়ে ক্যামেরা বসানো, ছবি প্রিন্ট করার জন্যে কাচের ছাদ আঁটা ডার্ক রুম। বাড়িতে যেন সৃষ্টিকর্মের এক বিশাল আয়োজন চলত সব সময়।

তার ওপর দিদিমা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন ডাক্তার। তাঁর ঘরে ঝুলত আস্ত একটা মানুষের কঙ্কাল। পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু আবার জগদীশ বসুর ভাগ্নে। কলকব্জা আর ল্যাবরেটরিতেই তাঁর আগ্রহ। সারাদিন ধরে গবেষণাগারে তৈরি করতেন কতরকম প্রসাধন সামগ্রী। কুন্তলীন তেল নিয়ে তো তাঁর তখন খুব নাম ডাক। অতএব সুকুমারের শৈশব কেটেছে সৃষ্টির আনন্দ আর বিজ্ঞানের বিচিত্র পরিবেশে।

ডবল অনার্স নিয়ে পাশ করার পাঁচ বছর পরেই মুদ্রণ শিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন সুকুমার। ক্যালেণ্ডারের পাতায় তখন 1911 সাল। লণ্ডনের কাউন্টি স্কুল অফ ফটো এনগ্রেভিং অ্যাণ্ড লিথোগ্রাফিতে আর ম্যাঞ্চেস্টারের মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ টেকনোলজিতেও তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন মুদ্রণ শিল্পের নানা দিক নিয়ে। ফটো-গ্রাফিতেও ছিল তাঁর অনন্য স্বকীয়তা।

বাবা উপেন্দ্রকিশোরের অবর্তমানে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে 'সন্দেশ' পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বিজ্ঞানের। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখার সেই প্রথম যুগেই সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন সুকুমার। রেডিও আবিষ্কারের সেই গোড়ার দিকেই রেডিও তরঙ্গের ওপর তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশে। লেখার নাম, 'আকাশবাণীর কল।' আমাদের ভাবতে এখন আশ্চর্য লাগে, আজকের এই বহুখ্যাত 'আকাশবাণী' নামটি রবীন্দ্রনাথও যখন দেননি —ঠিক তখন, অনেক আগেই রেডিও তরঙ্গের এই সহজ এবং সাবলীল পরিভাষাটির প্রথম চিন্তা করেছিলেন সুকুমার রায় স্বয়ং।

মজার লেখা, হাসির লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের কথা ভেবে বিজ্ঞানের কত বিষয় নিয়ে যে তিনি লিখেছেন, তার ঠিক নেই। বিজ্ঞানীদের জীবনী ছাড়াও জীবনবিজ্ঞান জ্যোতি-

বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপরে তাঁর নজর ছিল সমান। পদার্থবিদ্যা নিয়েও লিখেছেন কিছু কিছু। তবে সব লেখাই খুব সুখপাঠ্য আর সহজ করে লেখা। অথচ কোথাও একটুও খাটো করেননি বিজ্ঞানকে। এক জায়গায় লিখেছেন,, 'চাঁদের উপর দূরবীন কষিয়া দেখা গেল তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা।'

আবার অঙ্কশাস্ত্রের 'জিওমেট্রিকাল প্রগ্রেসান'-এর ওপরেও গল্প লিখেছেন তিনি। গল্পের নাম 'দানের হিসাব।' যেখানে এক কৃপণ রাজা দুর্ভিক্ষ জেনেও প্রজাদের দিতে চাননি দশহাজার টাকা। সেখানে হঠাৎ এলেন এক সন্ন্যাসী। ভিক্ষা চাইলেন কৌশলে। বললেন, আজ এক পয়সা দিলে কাল দেবেন দু পয়সা। পরের দিন চার পয়সা তার পরের দিন আট পয়সা। এই রকম হিসেবেই ভিক্ষা চাই মাত্র তিরিশ দিন। রাজার খুব আনন্দ। কোষাগারের খাজাঞ্চিকে আদেশ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। দিব্যি চলছিল কদিন। হঠাৎ মাসের মাঝামাঝি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন খাজাঞ্চি। ছুটলেন রাজার কাছে। যোগফল শুনে তো রাজার ভির্মি খাওয়ার মত অবস্থা। দানের যোগফল দাঁড়িয়েছে 'এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো পনের টাকা পনের আনা তিন পয়সা।' রাজা তখন সন্ন্যাসীর হাতে পায়ে ধরে পঞ্চাশ হাজার টাকায় রফা করলেন।

এই গল্পে সুকুমার যোগফলের যে শ্রেণী ব্যবহার করেছেন সেটি একটি গুণোত্তর শ্রেণী। অথচ গল্পটা পড়তে পড়তে মজা আর কৌতুকের কারুকার্যে চাপা পড়ে যায় সেই পদ্ধতি। বোঝা যায় না, গল্পের সঙ্গে কেমন গাঁটছড়া বেঁধেছে বিজ্ঞান।

এই রকমই ছিলেন সুকুমার রায়। বিজ্ঞান-মনস্ক, বিজ্ঞান-সচেতন এক রসিক মানুষ। তিনি একাধারে কবি, অনন্য-সাধারণ শিল্পী। তাঁর ভাবালুতায় ভরা দুচোখের চশমায় ছিল দুটুকরো কাচ। তার একটিতে যদিও ছিল কল্পনার মিশেল, তাহলে অন্যটিতে ছিল বিজ্ঞানের স্বচ্ছতা।

'আবোল তাবোল'-এর ছড়া, কিম্বা 'হযবরল'-এর গল্প থেকে 'অবাক জলপান' নাটকের মধ্যে আজও আমরা তাই অনুভব করি বিজ্ঞান ভাবনায় সার্থক একজন কবিকে। যাঁর আর এক নাম সুকুমার রায়।

ছড়া

।। মলাট ছুঁয়ে ।।

প্রণতি মজুমদার

আজগুবি নয়, উদ্ভটও নয়
সত্যিকারের কথা,
অসম্ভবের দেশটা জুড়ে
সোনারূপোর লতা।
ছায়াবাজির দরকারি সেই
নোটিশ যারা জানে,
আমড়া গাছের নোংরা ছায়ার
কথাও তারা মানে।
খুড়োর কল তো খোলাই আছে
সব দেখ খুব দিশি,
ফুটোস্কোপের সার কথা তা-ও
চোদ্দ আনা শিশি।
হ য ব র লয়ের দেশে
সুকুমার রায় তিনি,
একশো ফুলের মধ্যিখানেও
সবাই তাঁকে চিনি।
তাঁরই তো এই 'আবোল তাবোল'
খেয়াল খুশির খাতা,
আজকে এসো, মলাট ছুঁয়ে
ঠেকাই তাতে মাথা।

পোঃ-হেলান, হুগলী।

জানা-অজানার নানা খবর

রেবতীভূষণ

পাখিদের বাসা-বৈচিত্র্য নিয়ে আরো অনেক মজার খবর দেবার ইচ্ছে আছে। আপাততঃ এই ব্যাপারে ধনেশ পাখির কাণ্ডকারখানা শুনিয়ে বাসা পর্যায় শেষ করি। গাছের কোটরে ডিম পাড়ার পর ধনেশ মশাই তার গিন্নীকে ঘিরে কাদামাটি আবর্জনা এমনকি নিজের দেহমল দিয়ে একটি পুরু আবরণ রচনা করে সেটি প্রায় ঢেকে ফেলে। প্রায় মানে শুধু ধনেশ গিন্নীর ঠোঁট-দুটি একটি ফোকর দিয়ে বের হয়ে থাকে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত ধনেশ তার বিশাল ঠোঁটে করে গিন্নীকে নিয়মিত আহার যুগিয়ে চলে।

KJB/Dec/87/3

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার / চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

পারতেই হবে। কে বলেছে—এই পোর্টো সান্টো দ্বীপ থেকে বহুদূর পশ্চিমে সে দেশ নেই? তবে কোথা থেকে একদিন ভাসতে ভাসতে এসেছিল সেই শিল্প-মণ্ডিত কাষ্ঠখণ্ড? পোর্তুগীজ নাবিক মার্টিন ভিনসেণ্ট যেটি দেখেছিলেন? সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপ থেকে প্রায় 400 লীগ পশ্চিমে তিনি তখন চলেছেন। হঠাৎই একদিন ধেয়ে এলো ভীষণ ঝড়। সুদূর পশ্চিম থেকে মাতাল বাতাস তাঁদের জাহাজটাকে যেন লণ্ডভণ্ড করে ডুবিয়ে দেবে অতল সমুদ্রে—এমন রোষ। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বয়ে চললো সেই প্রবল ঝড়। তারপর হঠাৎই তাঁদের জাহাজখানার গায়ে এসে লাগলো

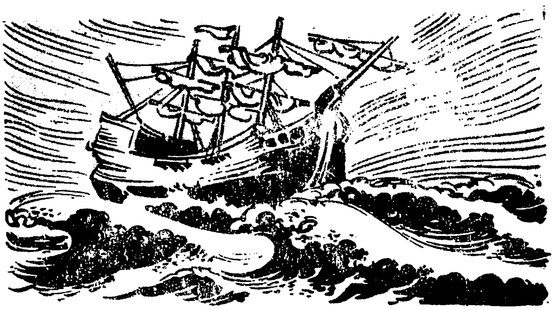

এক অকল্পিত কাষ্ঠখণ্ড। কী অপূর্ব তার খোদাইয়ের কাজ! সেই কাঠ,কেউ কখনো দেখেনি। সেই নকশা, কেউ ভাবেনি। পশ্চিমে যদি দেশ কোথাও না থাকবে, তবে সাগর তরঙ্গে ভেসে আসা ঐ কাঠ কোথা থেকে এসেছিল? তারা কারা যারা খোদাই করেছিল ঐসব নকশা?

ফেলিপার দাদা পেড্রো কোরিয়া এই পোর্টো সান্টোরই তটভূমিতে একদিন দেখতে পেয়েছিলেন একগুচ্ছ বাঁশ। কী বিশাল তাদের আয়তন। এক একটি পর্বের মধ্যে 4 কোয়ার্টজ পানীয় অনায়াসেই ভরা যায়। এমন বাঁশ ইউরোপে হয় না। তবে? কোথা থেকে ওগুলি এসেছিল? আর কলম্বাস যদি ঈশ্বরপ্রেরিত না হবেন, তবে পৃথিবীতে এতো দেশ, এতো দ্বীপ থাকতে ওগুলি পোর্টো সান্টোতেই বা কেন এলো? সেই অপরিচিত দেশের মাটি, সেখানকার মানুষ কি কলম্বাসকেই ডাকছে না? বলছে না···এসো, এসো, তুমি এসো। সভ্য পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের ঠাঁই দাও। কতো প্রমাণ চাই? ফ্লোরেন্সের মানুষ আজও পূজো করে দুটি সুন্দর অপরিচিত মানুষকে, যাদের মুখের চোয়াল অত্যন্ত বেশী প্রশস্ত, যাদের চেহারা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মেলে না। তারা কারা? কোত্থেকে এসেছিল?

অতএব যেতে হবে। এক অজানা জলপথের সন্ধানে এই অভিযাত্রায় কোন কালক্ষয় করা আর চলবে না। রক্তে রক্তে দুরন্ত যৌবনের উন্মাদনা। এইতো লড়াই করবার বয়স। কিন্তু তার জন্যে চাই বেশ কয়েকখানা জাহাজ।—আটলান্টিকের পাহাড় প্রমাণ ঢেউ যারা পার হয়ে যাবে অবলীলায়। চাই কয়েক শো দুর্নিবার নাবিক—দুরন্ত দামাল, যাদের লক্ষ্য থাকবে অটুট, প্রচেষ্টা অনলস। চাই বেশ কয়েক মাসের খাবার, অজস্র টাকা। কে যোগাবে? পোর্তুগালের সিংহাসনে রাজা দ্বিতীয় জন সবে বসেছেন। তিনি কি রাজী হবেন এই অসমসাহসিক অনুসন্ধানের জলযাত্রায়? তিনি কি বিশ্বাস করবেন সুদূর জেনোয়া থেকে আগত এই নবীন যুবককে? কী পরিচয় কলম্বাস তাঁর সামনে রাখবেন? পোর্তুগালকেই তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে মেনে নিয়েছেন কলম্বাস, কিন্তু রাজা জন কি তা স্বীকার করবেন?

পোর্তুগীজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র গোল্ডকোস্ট। রাজার নির্দেশে সেখানে তৈরী হচ্ছে এক নতুন দুর্গ—সেণ্ট জর্জ। এল মিনা-র এই দুর্গ নির্মাণের কাজে এবার যাত্রা করলেন কলম্বাস। খ্রীষ্টাব্দ 1481। দিয়েগো দ্য আজামবুজার সহযোগিতায় এক বছরেরও অধিক কাল তিনি নিযুক্ত রইলেন দুর্গের নকশা এবং নির্মাণের তদারকিতে। অবসর সময়ে ভুগোল, নৌচালনবিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব আর জ্যোতির্বিদ্যার বই নিয়ে অবিরাম পড়াশোনা করেন কলম্বাস। রচনা করেন তাঁর কল্পিত পৃথিবীর মানচিত্র। অঙ্ক কষে দেখেন কতো দীর্ঘ হবে তাঁর যাত্রাপথ।

দুর্গের কাজ শেষ করে **1482** খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলম্বাস ফিরে এলেন পোর্তুগাল। একের পর এক রাজকর্মচারীর বিশ্বাস এবং সহানুভূতি অর্জন করতে আরও এক বছর কেটে গেল। এলো **1484**। অপরিমিত অধ্যবসায়ের পর অবশেষে দেখা দিল আকাঙ্খিত দিনটি। রাজা জন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিলেন।

[চলবে]

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

রান্নাঘরের কাজ

বাজার থেকে বাবা একটা সুন্দর টোস্টার কিনে এনেছেন। সেটাতে দুটো রুটি পাশাপাশি রেখে সেঁকে ফেলা যায়। ওটা দেখিয়ে বাবা বললেন—তোরা মাখন-টাখন রেডি কর আমি বরং রুটিটা সেঁকে দিই। মা ও মেয়ে সমস্বরে জানালো তাদের খুব খিদে পেয়েছে। যা করার তাই তাড়াতাড়ি করা দরকার।

বাবা : দেখা যাক। একটি রুটির দুপিঠ সেঁকে নিতে সময় লাগবে তিন আর তিন ছ'মিনিট। যেহেতু একসঙ্গে দুটি রুটি বসানো যায় তাই সময় লাগবে বারো মিনিট। প্রথমবারে দুটি রুটি একই সঙ্গে ছ' মিনিট আর তৃতীয়টির দুপিঠ সেঁকে নিতে আরো ছ' মিনিট। সুতরাং তাড়াহুড়ো করলে কি হবে বারো মিনিট অপেক্ষা করতেই হবে।

মেয়ে : বাবা, তুমি কিন্তু আসলে এটা আরো কম সময়েই সারতে পারো। আমি হিসেব করে দেখলাম অন্তত তিন মিনিট তুমি বাঁচাতেই পারো।

মেয়েটির হিসেবটা আগামী সংখ্যায় বলব কিন্তু ততক্ষণ তোমরা কি আর অপেক্ষা করবে? নিজেরাই বার করে ফেলবে নিশ্চয়ই বুদ্ধিটা।

কার্বন / অমরনাথ রায়

পর্যায় সারণীর ছয় নম্বর মৌলটির নাম কার্বন। এই মৌলটি কবে যে আবিষ্কৃত হয়েছিল বা কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে একথা সত্যি যে আগুন জ্বালাবার কৌশল জানবার অনেক আগে থেকেই মানুষের সঙ্গে কার্বনের পরিচয় ঘটেছিল। এরপর মানুষ যখন আগুনে কাঠ পুড়িয়ে কার্বন পেলো, তখন থেকেই কার্বন হলো মানুষের নিত্য সহচর। 1824 খ্রীস্টাব্দে মৌলটির নামকরণ করা হয় 'কার্বন'। কার্বন কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Carbo থেকে, যার অর্থ Coal বা কয়লা। কার্বন যে একটি মৌল তা প্রথম প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে। অবশ্য তার অনেক আগে 1787 খ্রীস্টাব্দে ল্যাভয়সিয়ে, বার্থেলো, ফোরক্রয় (Four croy) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সম্পাদিত "Methods of Chemical Nomenclature" গ্রন্থে Carboneum (Carbon) নামটির উল্লেখ দেখা যায়।

যাই হোক, কার্বনের চিহ্ন হলো C, পরমাণু ক্রমাঙ্ক 6, পারমাণবিক গুরুত্ব 12, পর্যায় সারণীতে অবস্থান গ্রুপ IV B তে, ইলেকট্রন বিন্যাস $1S^2$-$2S^2$-$2P^2$, তড়িৎ ঋণাত্মকতা 2·5, সাধারণ যোজ্যতা 4 এবং আইসোটোপ বা সমস্থানিকের সংখ্যা 5। কার্বনের আবিষ্কার কাল খ্রীস্টপূর্বাব্দ কোনও এক অজ্ঞাত যুগ। $_6C^{12}$ চিহ্ন দ্বারা সাধারণ কার্বনকে বোঝানো হয়। যদিও মৌলটির সমস্থানিক পাঁচটি, তার মধ্যে কেবল 12 এবং 13 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট সমস্থানিক দুটিই স্থায়ী। পরবর্তী ভরসংখ্যা বিশিষ্ট সমস্থানিকগুলি তেজস্ক্রিয়। ভূত্বকে 0·089% কার্বন আছে, আর প্রকৃতিতে $_6C^{12}$ আছে 98·89%।

কার্বনকে মুক্ত ও যুক্ত—উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়। মুক্ত অবস্থায় কার্বনকে পাওয়া যায় হীরা ও গ্রাফাইটরূপে ; আর যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় অনেক যৌগে, যথা চুনাপাথর, চিনি, স্টার্চ, মার্সগ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে এবং প্রতিটি জৈব যৌগে। বাতাসে কার্বন থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 0·03%। সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে কার্বন আছে, অবশ্য তা যুক্ত অবস্থায়। জানা যৌগসমূহের শতকরা প্রায় নব্বইটিতেই কার্বন আছে। কার্বনের এই বিপুল সংখ্যক যৌগের আলোচনার জন্যে রসায়নের এক বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে, যার নাম 'জৈব রসায়ন'।

কার্বনের বহুরূপতা ধর্ম আছে, যার জন্যে এর অনেকগুলি রূপভেদ আছে। এই রূপভেদগুলিকে আমরা প্রধানতঃ দু' ভাগে ভাগ করতে পারি—নিয়তাকার ও অনিয়তাকার। নিয়তাকার রূপভেদ সংখ্যায় 2টি—হীরা ও গ্রাফাইট। অনিয়তাকার রূপভেদের মধ্যে আছে চারকোল, ভুসোকালি, কোক্ ও গ্যাস কার্বন। চারকোল আবার দু'রকম—উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ। উদ্ভিজ্জ চারকোলের অন্তর্গত হলো কাঠকয়লা ও শর্করা অঙ্গার। আর অস্থি অঙ্গার ও রক্ত অঙ্গার হলো প্রাণিজ অঙ্গারের অন্তর্গত। বিশুদ্ধ চিনিকে বাতাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে সেই চিনি বিশুদ্ধ শর্করা অঙ্গারে পরিণত হয়। আবার কয়লাকে বাতাসের অনুপস্থিতিতে বকযন্ত্রে উত্তপ্ত করলে বকযন্ত্রের মধ্যে যে কঠিন ও কালো পদার্থ পড়ে থাকে তাকে কোক কয়লা বলে। রক্তের অন্তর্ধূম পাতনে পাওয়া যায় রক্ত অঙ্গার। এ ছাড়া অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকে কোল-গ্যাস উৎপাদনের সময় উপজাত পদার্থরূপে গ্যাস কার্বন পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি কার্বনসমৃদ্ধ পদার্থের নিয়ন্ত্রিত বায়ুর উপস্থিতিতে পোড়ালে যে কালো ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তাকে একটি শীতলপাত্রে সংগ্রহ করলে ভুসাকালি পাওয়া যায়। ভুসাকালিতে কার্বনের পরিমাণ 99%। নারকেলের মালা (খোল) কে বাতাসের অনুপস্থিতিতে অন্তর্ধূম পাতন করলে অনিয়তাকার কার্বন বকযন্ত্রের মধ্যে অবশেষরূপে পড়ে থাকে। এই কার্বনকে স্টীমে 800°C—900°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় 'সক্রিয় অঙ্গার'। হীরা ও গ্রাফাইট ছাড়া কার্বনের অন্যান্য রূপভেদগুলির (সক্রিয় অঙ্গার সহ) পৃষ্ঠতলের আয়তন অনেক বেশি হওয়ার জন্যে এরা গ্যাস শোষণে সক্ষম। সক্রিয় অঙ্গারের আবার অধিশোষণ (absorption) ক্ষমতা আছে। তাছাড়া এর বিরঞ্জন ও স্বাদ অপসারণ ক্ষমতাও আছে।

20°C উষ্ণতায় হীরার ঘনত্ব 3·51 গ্রাম প্রতি সি সি.। ঐ উষ্ণতায় গ্রাফাইটের ঘনত্ব 2·22 গ্রাম প্রতি সি. সি. এবং অন্যান্য কার্বনের ঘনত্ব ·85 থেকে 2·07 গ্রাম প্রতি সি সি.। হীরা ও গ্রাফাইট ছাড়া অন্যান্য কার্বনের ঘনত্ব জলের প্রায় দ্বিগুণ হলেও ভুসাকালি, কাঠকয়লা ইত্যাদি জলে ভাসে, কারণ এইসব কার্বনেরা গ্যাস শোষণ করে থাকে। সব মৌলের মধ্যে কার্বনের গলনাংক ও স্ফুটনাংক সবচেয়ে বেশি। কার্বনের গলনাংক প্রায় 3550°C এবং স্ফুটনাংক 4200°C প্রকৃতিজাত সকল পদার্থের মধ্যে হীরা হলো কঠিনতম। আবার যে কোনও কার্বনই স্বাদহীন, গন্ধহীন, অনুদ্বায়ী এবং যে কোন দ্রবণে অদ্রাব্য। অবশ্য অনিয়তাকার কার্বন গলিত ধাতুতে দ্রাব্য। সাধারণ উষ্ণতায় হীরা ও গ্রাফাইট নিষ্ক্রিয় বটে, তবে অত্যধিক তাপে যে কোন কার্বনই অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সাইড যৌগে পরিণত হয়। 14 ভর-সংখ্যা বিশিষ্ট সমস্থানিকটি (C^{14}) যে তেজস্ক্রিয়, সে কথা আগেই বলেছি। এর অর্ধ আয়ুষ্কাল হলো 5760 বছর। হীরার প্রতিটি কার্বন পরমাণু অপর চারটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হয়ে কেলাস গঠন করে। হীরার কেলাস গঠনে অসংখ্য কার্বন পরমাণু ত্রিমাত্রিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে হীরার অতিকায় অণু গঠন করে। অপরপক্ষে গ্রাফাইটের কেলাসে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে সুষম ষড়ভুজ তৈরি করে এবং দ্বিমাত্রিক স্তর গঠন করে। হীরা তড়িৎ অপরিবাহী কিন্তু গ্রাফাইট তড়িৎ পরিবাহী।

হীরা অতি মূল্যবান পদার্থ। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, আমেরিকা ও ভারতের গোলকুণ্ডার খনিতে হীরা পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরা বর্ণহীন কিন্তু তাতে অবিশুদ্ধি থাকলে তার রং কখনও নীল, কখনও গোলাপী, কখনও সবুজ, আবার কখনও বা কালো হয়। হীরার প্রতিসরাংক বেশি। ঔজ্জ্বল্য ও বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্যের জন্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হীরা রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে নিকৃষ্ট শ্রেণীর হীরা অস্বচ্ছ ও কালো রঙের। এরা বোর্ট বা কার্বনেডো নামে পরিচিত। এরা রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। কাচ কাটা, হীরা কাটা ও পাথরে ছিদ্র করার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উপায়েও হীরা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার দাম প্রাকৃতিক হীরার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে যায়। হীরার ওজন ক্যারাট (Carat) এককে প্রকাশ করা হয়। এক ক্যারাট = 0·205 গ্রাম। বিশ্ববিখ্যাত কোহিনূর হীরার মূল ওজন 186 ক্যারাট। আর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরা কুলিনান-এর মূল ওজন ছিল 3024 ক্যারাট। গ্রাফাইটকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সাইবেরিয়া ও ভারতের সিকিম রাজ্যে।

এন. বি. টি / 99A নিউট্রাফিক, ইন্দা, মেদিনীপুর।

বিজ্ঞান সংবাদ

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী

সম্প্রতি, গত 24শে অক্টোবর '87 মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে, সারা ভারত জন বিজ্ঞান জ্যাঠার, মুর্শিদাবাদ জিলা কমিটির সহযোগিতায় এক বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কাতলমারী ও নবীপুর এই দুই স্থানে ভিডিও ও স্লাইড প্রদর্শনীর মাধ্যমে "বিজ্ঞান ও শান্তি" ও "মানুষ ও পরিবেশ" বিষয় দুটি নিয়ে আলোচনা হয়। অংশ গ্রহণ করে পরিষদের তিন উৎসাহী কর্মী সৌমেন বিশ্বাস, সৈয়দ রিয়াজ কাদির ও অপ্রতিম চন্দ। পরিষদ সম্পাদক ডঃ মিহির দত্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদের টিম জেলার সর্বত্র এই রকম প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চলেছে। — **পার্থ মুখোপাধ্যায়**

শিবলুনে সফল বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত 31শে অক্টোবর 1 নভেম্বর দুদিনের এক বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়ে গেল কেতুগ্রাম থানার শিবলুন গ্রামে। ভারত জন বিজ্ঞান মঞ্চের স্থানীয় শাখা এবং শিবলুন ভ্রাতৃসংঘের যৌথ উদ্যোগে দুদিনের এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন কাটোয়া কলেজের শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক অঞ্জনকুমার পাল মহাশয়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নিমাই তেওয়ারী, তপোময় ঘোষ ও নিতাই ঘোষ। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে মহান দায়িত্ব নিয়ে সারা ভারতে বিজ্ঞান জাঠা সংঘটিত হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটি এতদ্-অঞ্চলে এই প্রথম। সাড়াও তাই অভূতপূর্ব। দুদিনে প্রায় দশ হাজার দর্শনার্থী ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মডেলগুলি প্রত্যক্ষ করেন ও তৃপ্ত হন। **তপোময় ঘোষ**

বানারহাট সন্ধানী বিজ্ঞান চক্রের উদ্যোগে সি. ভি. রামনের শততম জন্মদিবস পালন

গত 7 নভেম্বর '87 শনিবার বানারহাট সন্ধানী বিজ্ঞান চক্রের উদ্যোগে এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের শততম জন্মদিবস পালন করা হয়। এই কৃতী বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মধারা নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে শ্রীতুষারকান্তি সরকার এবং শ্রীসুনীল চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি পোস্টার প্রদর্শনী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছোট ছোট বিজ্ঞান বিষয়ক খেলনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানা বিষয় বোঝানো হয়।

শ্যামল মিত্র

লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

1. সালোকসংশ্লেষে অক্ষম এমন একটি উদ্ভিদের নাম কর।
2. ফোটন কণা কাকে বলে ?
3. বায়ুতে CO_2-র পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের কি ঘটে ?
4 ক্লোরোসিস কাকে বলে ?
5. হিল বিক্রিয়া কাকে বলে ?
6 সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন জল, উদ্ভিদের কি কাজে লাগে ?
7. সালোকসংশ্লেষে উৎপাদিত প্রথম কার্বন যুক্ত জৈব যৌগের নাম কর।
8 সালোকসংশ্লেষকারী কোষে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে কি হয় ?
9. আত্তীকরণ শ্বেতসার কাকে বলে ?
10. ক্লোরেলা কি ?
11. সবুজ উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে- একথা কে প্রমাণ করেন ?
12. শ্বসন সম্পূর্ণ বন্ধ হলে জীবদেহের কি পরিণতি ঘটে ?
13. শ্বাস রঞ্জক কাকে বলে ?
14. উদ্ভিদের শ্বাস অঙ্গের নাম কি কি ?
15. ডিমের কুসুম হলুদ রং-এর হয় কেন ?
16. নিঃশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কত ?
17. ক্ষয় পূরণ বিন্দু কাকে বলে ?
18. ফোটোলিসিস্ কাকে বলে ?
19. NADP-র পুরো নাম বল।
20. পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের জলের উৎস কি ?
21. দুটি পলিস্যাকারাইডের উদাহরণ দাও।
22. কার্বোহাইড্রেটের তাপন মূল্য কত ?
23. একটি সংযুক্ত প্রোটিনের নাম বল।
24. ফ্যাটের তাপন মূল্য কত ?
25. ফ্যাটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 2 ঃ 1 অনুপাতে থাকে কি ?
26. ভিটামিন কথাটি কে প্রথম প্রবর্তন করেন ?
27 কি কি ভিটামিন মানুষের শরীরে সংশ্লেষিত হয় ?
28. হাইপোভিটামিনোসিস কি ?
29. অ্যান্টিভিটামিন কি ?
30. ভিটামিন A-র রাসায়নিক নাম কি ?
31. একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রতিদিন কতটা ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয় ?
32. দুটি শবাহারী (Carrion Feeder) প্রাণীর নাম বল।
33. দুটি বহিঃপরজীবী প্রাণীর নাম বল।
34. অ্যামিবা কিসের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে ?
35. ভিলাই কাকে বলে ?
36. প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে শর্করা বা গ্লুকোজের পরিমাণ কতটা থাকা উচিৎ ?
37. মৌল বিপাক কি ?
38. একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর প্রতিদিন মৌল বিপাকের হার কত ?
39. উদ্ভিদের প্রয়োজন এমন দুটি মাইক্রো এলিমেন্টের উদাহরণ দাও।
40. ঘটপত্রী, সূর্যশিশির প্রভৃতি পতঙ্গভুক উদ্ভিদ পতঙ্গ না পেলে কি বাঁচে ?
41. একটি প্রাণীর নাম কর যেখানে বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক দেখা যায়।
42. মলের বর্ণ হলুদ হয় কেন ?
43. ইউরিয়া কোথায় এবং কোন পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় ?
44. একটি সুষম খাদ্যের উদাহরণ দাও।
45. ক্রমসংকোচন (peristalsis) কাকে বলে ?
46. পিত্তরসে কোন উৎসেচক না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এরা পরিপাকে সাহায্য করে ?
47. দুটি প্রাণীর মধ্যে মিথোজীবীয় পুষ্টির উদাহরণ দাও।
48. কোন ভিটামিন রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে ?
49. অস্টিও ম্যালেসিয়া কি ?
50. একটি আংশিক মৃতজীবী উদ্ভিদের নাম কর।
51. ফ্লোয়েমের কোন কোন উপাদান সজীব ?
52. দুটি অর্ধভেদ্য পর্দা বা সেমিপারমিয়েবেল মেমব্রেনের উদাহরণ দাও।
53. ব্যাপন এবং অভিস্রবণ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটিতে পর্দার প্রয়োজন হয় ?
54. উদ্ভিদের যে সব অঙ্গে ফ্লোয়েম কলা নেই সেখানে খাদ্যবস্তু পরিবহণ কি ভাবে হয় ?
55. ম্যাক্রিপোরাইট কি ?

56. হিমোসিল (Haemocoel) কি ?
57. আমাদের রক্তে কি পরিমাণ রক্তরস ও রক্তকোষ থাকে ?
58. চিংড়ি, কাঁকড়ার রক্তের রঙ নীলাভ হয় কেন ?
59. স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণিকাগুলো কোথায় তৈরি হয় ?
60. হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন যুক্ত হলে তাকে কি বলে?
61. ওলিগোসাইথিমিয়া কাকে বলে ?
62. কোন প্রকার রক্ত কণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রক্ষা করে ?
63. লিউকোপেনিয়া কি ?
64. লিউকোমিয়া কাকে বলে ?
65. মানুষের রক্ত তঞ্চনে কতটা সময় লাগে ?
66. লসিকা কাকে বলে ?
67. ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্ত ঝাঁকুনি দিয়ে চলে কেন ?
68. রক্তের একমুখী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ কে করে ?
69. হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি কি যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায় ?
70. রক্তনালীর মধ্যে প্রবহমান রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?
71. কিসের উপর ভিত্তি করে রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
72 কোন্ কোন্ প্রাণীদের বৃক্ক পোর্টাল শিরা থাকে না ?
73. সিস্টেমিক শিরা কাদের বলা হয় ?
74. ধমনী ও শিরার মধ্যে কার স্পন্দন নাই ?
75. রক্ত জালক কাকে বলে ?

উত্তর 51 পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান না-পড়ে বিজ্ঞানী

মিলিকান আমেরিকার বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী। কিন্তু বিস্ময়ের কথা স্কুল বা কলেজে পড়ার সময় তিনি কোনদিন পাঠ্য বিষয় হিসাবে পদার্থবিদ্যা পড়েননি। গ্রীক ভাষা ও ক্লাসিকস্ ছিল তাঁর পাঠ্য বিষয় এবং এতেই তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

স্কুলে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন মিলিকান। তাই তিনি যখন চাকরি খুঁজতে নিজের স্কুলে এলেন, ভীষণ খুশী হলেন স্কুলের মালিক। স্কুলের মালিকই ছিলেন মিলিকানের গ্রীক ভাষার শিক্ষক।

মিলিকানের চাকরি হয়ে গেল। কিন্তু তাঁকে কলেজের প্রিপারেটরী স্কুলে পড়াতে দেওয়া হল পদার্থবিদ্যা! মিলিকান তো অবাক্। জানালেন তাঁর অসুবিধার কথা। এ কথা শুনে তাঁর গ্রীক শিক্ষক বললেন, যে ভাল গ্রীক জানে তাকে দিয়ে এই ঝুঁকি নেওয়া যায়।

গ্রীক শিক্ষকের এই বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিলেন- মিলিকান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

বরুণ মণ্ডল / 73, শ্রীধর রায় রোড, কলিকাতা-39

বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম

সারা পৃথিবী আজ ওমর খৈয়ামকে চেনে তাঁর 'রুবাইয়াত' গ্রন্থটির জন্য। কিন্তু তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে, তাঁকে একদিন পৃথিবীর মানুষ চিনতেন বিজ্ঞানী—বিজ্ঞান লেখক হিসাবে। তাঁর বর্তমান কবিখ্যাতি সেই পরিচয় ম্লান করে দিয়েছে। তিনি গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রাজনীতি সম্পর্কে কুড়িটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের সংগ্রহশালায় রাখা আছে। ওমরের বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থটির নাম 'আল জাবর ওয়াল মুকাবেলা'। 'জিজা-ই-মালিক শাহী' হল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ। মুসলিম সমাজে প্রচলিত পঞ্জিকা-পদ্ধতির ভুল ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে রচনা করেন 'তারিখ-ই-জালালী'। 'মুশকিলাত-ই-হিসাব' জ্যামিতি বিষয়ক একটি গ্রন্থ।

ইলেকট্রনিক্সের কথা

বিপ্লব ব্যানার্জী

আশা করি ট্রানজিস্টার সম্বন্ধে এর মধ্যে তোমাদের বেশ কিছুটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। এবার ট্রানজিস্টার সম্বন্ধে আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যা তোমাদের পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে লাগবে।

1) Cut off Frequency : কমন এমিটার সার্কিটে Cut off Frequency হল সেই frequency যে frequency তে ট্রানজিস্টারের বিটার (β) মান দাঁড়ায় এক 1KHZ তরঙ্গে বিটার মানের 0·707 ভাগ।

2) Gain-Bandwidth Product : এটাও হল এমন একটা frequency যে frequency তে কমন-এমিটার সার্কিটে বিটার মান দাঁড়ায় unity বা এক। Gain-Bandwidth Product কে সাধারণতঃ f_T চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

3) Transit Time : ইলেকট্রনস বা হোলস্‌কে একটি তড়িৎদ্বার থেকে আরেকটি তড়িৎদ্বার অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় Transit Time বা অতিক্রম সময়। এখন কমন বেস সার্কিটে Transit Time হল সেই সময় যে সময়ে electron বা hole গুলি এমিটার থেকে কালেকটার অতিক্রম করে।

Hybrid Parameters বা h-Parameters :

যে কোন ট্রানজিস্টার সার্কিটে কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যা ট্রানজিস্টার সার্কিটের resistance, inductance এবং capacitance-এর উপর নির্ভরশীল এবং এগুলি এক ধরনের ধ্রুবক বা constants ছাড়া আর কিছুই নয়; আর এই constants গুলিকেই বলা হয় network constant বা parameter। এখন এই constant গুলিকে কতকগুলি স্বাভাবিক সমীকরণ দ্বারা খুব সহজেই প্রকাশ করা সম্ভব।

একটা ট্রানজিস্টার সার্কিটে সাধারণতঃ চারটি h-parameter থাকে।

1) hi—input impedance যা ohms একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

2) ho—output admittance যা ohms এর উল্টো অর্থাৎ mhos একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

3) hf—forward current transfer ratio—এর কোন একক নেই।

4) hr—reverse-voltage transfer ratio—এরও কোন একক নেই।

উপরোক্ত চারটি ক্ষেত্রেই আরও একটি অতিরিক্ত বর্ণ বা letter (subscript) যুক্ত করা হয়, যা এক এক ধরনের সার্কিটের সাধারণ তড়িৎদ্বারটিকে নির্দেশ করে। উদাহরণ-স্বরূপ hFB-র ক্ষেত্রে B-letter টি Common base নির্দেশ করে আর hFB-র পুরোটা নির্দেশ করে একটা Common base ট্রানজিস্টার সার্কিটের d-c forward-current transfer ratio। অনুরূপে hfe নির্দেশ করে একটা কমন এমিটার ট্রানজিস্টার সার্কিটের small-signal forward-current transfer ratio।

নিচে h-parameters-এর একটা Table দিলাম। বোঝার চেষ্টা কর।

Parametres For	Common Base	Common Emitter	Common Collector
Output admittance	hob	hoe	hoc
Input resistance	hib	hie	hic
Forward-current transfer ratio	hfb	hfe	hfc
Reverse-voltage transfer ratio	hrb	hre	hrc

ট্রানজিস্টার বর্তনীর বিশ্লেষণ ও শর্তসাপেক্ষে আরও চার ধরনের parameters আছে যেগুলি নিচে দেওয়া গেল।

1) **r-parameters :** for resistance measurments with an open-circuit condition and at low frequencies.

2) **z-parameters :** for impedance measurments with an open-circuit condition and at high frequencies.

3) **g-parameters :** conductance measurments with a short-circuit condition and at low frequencies.

4) **y-parameters :** admittance measurements with a short circuit condition and at high frequencies.

ট্রানজিস্টারের আরও চারটি জিনিস খুবই প্রয়োজনীয় এবং মনে করে রাখার মত।

1) Current Gain (Ai), 2) Voltage Gain (Av), 2) Power Gain (Gp) এবং 4) Signal to noise ratio or noise figure বা noise factor বা NF দ্বারা সূচীত করা হয় যার সাধারণতঃ কোন একক থাকে না।

Current Gain : যে কোন ট্রানজিস্টার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল current gain বা forward current transfer ratio। কোন একটা ট্রানজিস্টার সার্কিটের current gain বা Ai বলতে বোঝায় উক্ত সার্কিটের output এবং input current এর অনুপাত যার কোন একক নেই।

এখন, $Ai = \frac{Io}{Ii}$ যেখানে,

Ai = current gain (or amplification)

Io = curreut in the output circuit.

Ii = current in the input circuit.

আবার কমন বেস, কমন এমিটার এবং কমন কালেকটার সাপেক্ষে তিন ধরনের current gain হয়ে থাকে।

1) $\alpha = hFB = \frac{\text{Change in collector current}}{\text{Change in emitter current}}$

$= \frac{dIc}{dIE}$ (at constant VcB) এবং সার্কিটটা হল কমন বেস সার্কিট। hFB parameterটিকে অনেক সময় alpha direct-current gain ও বলা হয়ে থাকে যার মান সব সময়েই 1 এর থেকে কিছু কম এবং সাধারণতঃ এর মান 0·94 to 0·99 এর মধ্যে হয়ে থাকে।

2) $\beta = hFE = \frac{\text{Change in collector current}}{\text{Change in base curr nt}}$

$= \frac{dIC}{dIB}$ (at constant VCE) এবং সার্কিটটা হল কমন এমিটার সার্কিট।

hFE parameterটিকে অনেক সময় beta direct-current gainও বলা হয়ে থাকে। যার মান 5 থেকে 950 পর্যন্ত হতেপারে।

3) $hFC = \frac{\text{Change in emitter current}}{\text{Change in base current}} = \frac{dIE}{dIB}$

(at constant VEC) এবং সার্কিটটা হল কমন কালেকটার। কমন কালেকটার সার্কিটকে অনেক সময় এমিটার ফলোয়ার সার্কিটও বলা হয়ে থাকে। কমন কালেকটর সার্কিট প্রায় কমন এমিটার সার্কিটের মতোই এবং current gain টা কমন এমিটার অপেক্ষা যৎসামান্য কিছু বেশি হয়ে থাকে।

Voltage Gain : কোন ট্রানজিস্টারের direct-voltage gain হল current gain এবং resistance gain এর গুণফল, অর্থাৎ $Av = Ai \times Ar$, যেখানে Av = Voltage gain or Voltage amplification যার কোন একক নেই আর Ar = resistaece gain বা output resistance এবং input registance এর অনুপাত, এরও কোন একক নেই। কমন বেস সার্কিটে voltage gain হয় খুব বেশি এবং কমন কালেকটার সার্কিটে voltage gain হয় প্রায় 1 এর কাছাকাছি।

Power Gain : কোন ট্রানজিস্টারের direct power gain হল current gain এর বর্গ ও resistance gain এর গুণফল। অর্থাৎ $Ap = Ai^2 \times Ar$, যেখানে Ap = power gain বা power amplification, এর কোন একক নেই। এখন কোন ট্রানজিস্টারের power gain কে বেশিরভাগ সময়েই decibels এককে প্রকাশ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে Gp = 10logAp, সেখানে Gp = power gain in decibels. প্রাসংগিকক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Alexander Graham Bell এর নামানুসারে কোন বর্তনীর output power এবং input power এর অনুপাতকে log-এ প্রকাশ করলে যে এককের জন্ম হয় তাকে বলা হয় bel একক, কিন্তু bel একক এত বড় একক যে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে এত বড় একটা একক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে প্রতি পদে পদে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমাদের কাজকর্মের সুবিধার্থে bel এককের দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট একক তৈরি করা হয়েছে, যাকে বলা হয় decibel এবং একে db দ্বারা সূচীত করা হয়। যেমন কোন বর্তনীর

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
আরে পঞ্চা, এই নির্জন পার্কে একাকি এরকম লুকোমুখোর মতো বসে কি করছিস? কবিতা টবিতা লিখছিস নাকি?
নাঃ, এমনি বসে আছি।
বাড়িতে বকেছে বুঝি?– যাঃ ব্বাবা, উঠলি কেন!
নাঃ, এমনি– তুই বোস।
আমি তো বোসবই, তুই উঠে পড়লি কেন? আমি চোর না পকেটমার!
না না, তা কেন! তুই আরাম করে বোস, এই জন্যেই–
আরাম, তুই কি ভেবেছিস আমি শুতে এসেছি? এটা রীতিমত ইনসাল্টিং ব্যাপার।
ছি ছি, তুই খামোখা নিজেকে এমন ভাবছিস! আমার কি ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু নেই? আমার ভাল লাগলে বোসবো, না লাগলে বোসবো না ব্যাস।
ঠিক কথা। তবে তোর এ হঠাৎ ভাল না লাগার ব্যাপারটাই আমার ভাল লাগেনি।

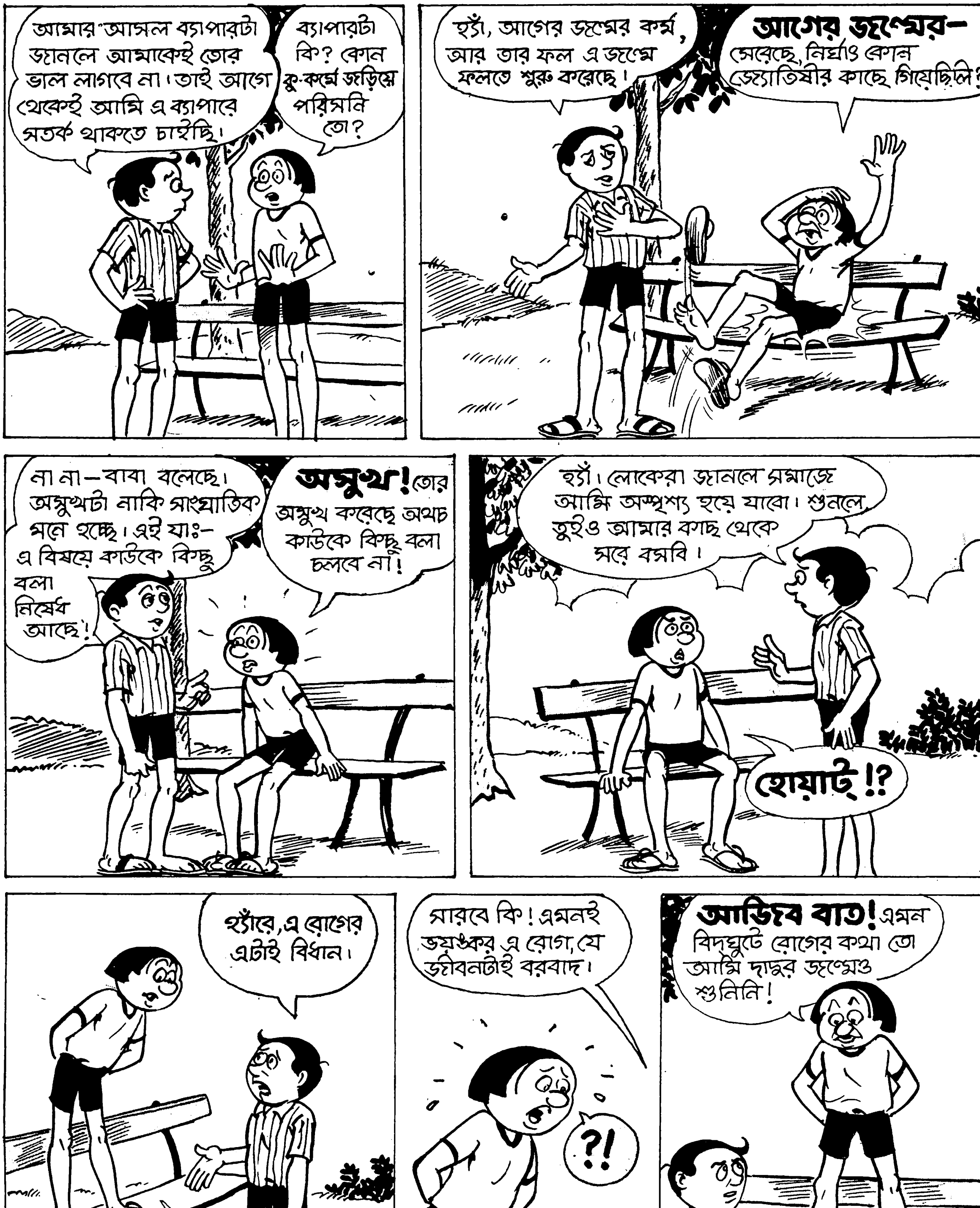
আমার আসল ব্যাপারটা জানলে আমাকেই তোর ভাল লাগবে না। তাই আগে থেকেই আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে চাইছি।
ব্যাপারটা কি? কোন কু-কর্মে জড়িয়ে পরিসনি তো?
হ্যাঁ, আগের জন্মের কর্ম, আর তার ফল এ জন্মে ফলতে শুরু করেছে।
আগের জন্মের— সেরেছে, নির্ঘাৎ কোন জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলি?
না না—বাবা বলেছে। অসুখটা নাকি সাংঘাতিক মনে হচ্ছে। এই যাঃ— এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা নিষেধ আছে!
অসুখ! তোর অসুখ করেছে অথচ কাউকে কিছু বলা চলবে না!
হ্যাঁ। লোকেরা জানলে সমাজে আমি অস্পৃশ্য হয়ে যাবো। শুনলে, তুইও আমার কাছ থেকে সরে বসবি।
হোয়াট্ !?
হ্যাঁরে, এ রোগের এটাই বিধান।
বিধান! বলি এতে কি রোগ সারবে?
সারবে কি! এমনই ভয়ংকর এ রোগ, যে জীবনটাই বরবাদ।
?!
আজিব বাত! এমন বিদঘুটে রোগের কথা তো আমি দাদুর জন্মেও শুনিনি!

শুনিস নি তো?—এই দ্যাখ হাতে—কিছু বুঝতে পারছিস?
এটা কি? এ তো সামান্য চুলকুনি কিংবা এগজিমা জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে।
প্রথমে আমরাও তাই ভেবেছিলুম। ক্রমশ এটা ছড়াচ্ছে, কেমন ফ্যাকাশে আর লোমগুলোও উঠে যাচ্ছে।
কত রকম স্কিন ডিজিজ আছে। ও মলম লাগালে সেরে যাবে
এই ক্ষতের চারপাশে কেমন একটা শিরশিরে ভাব, আর জায়গাটাতে কোন সাড় বা স্পর্শানুভূতি নেই!
আর বলতে হবে না। এ সবের মানেই হচ্ছে তোর লেপ্রসি হয়েছে।
হ্যাঁ, বাংলায় যাকে বলে কুষ্ঠ।
কি এখন কি আমাকে তেমন ভাল লাগছে? এই জন্য প্রথম থেকেই আমি সরে থাকতে চেয়েছিলুম।
আরে মুখ্যু, তুই তো দেখছি এখনও সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই রয়ে গেছিস!
তার মানে?
তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু!
রাসকেল! এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ কিনা করছে—হার্ট খুলে নকল নতুন হার্ট বসাচ্ছে, টেস্টটিউব শিশু জন্মাচ্ছে, মায় মানুষের খোল নলচে পাল্টে ফেলে নতুন মানুষ তৈরী করে দিচ্ছে। কুষ্ঠ তো সামান্য একটা রোগ।

আর তুই এখন ইডিয়েটের মত কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে গুহায় বসে কপাল চাপড়াচ্ছিস!
কিন্তু এটা যে কুষ্ঠ রোগ!
তাতে কি! তুই একে যতটা সিরিয়াস এবং ভয়ঙ্কর ভাবছিস বর্তমানে তা আর নেই। রোগ হয়েছে, চিকিৎসা করাও-সেরে যাবে।
এ রোগ সংক্রামক নয় বংশগতও নয় এমন কি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। তবে ছোটদের মধ্যেই এর প্রবণতা দেখা যায়।
তুই কি আজকাল ডাক্তারী শাস্ত্র নিয়েও নাড়াচাড়া করছিস?
আজ্ঞে না, আজকাল এ নিয়ে কত লেখালেখি আলোচনা বিজ্ঞাপন এক কথায় রীতিমত আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে! সুতরাং এ সম্বন্ধে কারো কিছুই অজানা থাকার কথা নয়। ব্যাতিক্রম তুই!
সুতরাং এ রোগে মরার আগে তোর উচিত গরুর গাড়ির তলায় চাপা পরে মরা।
সত্যি খুদে তোর কথায় আমার জ্ঞান চক্ষু খুললো।
তাই নাকি! তাহলে এখন কি করবি?
ডাক্তারের কাছে যাবো চিকিৎসা করাবো।
তোর তো দেখছি চোখের চামড়াই নেই তো খুলবে কি করে। ফি ছাড়া আজকাল কিছু হয়। আমার কনসালটেন্সি ফি হল এক টাকার ঝালমুড়ি। গো—কুইক্।
সরি!
থ্যাংক ইউ। এই এতক্ষণে তোর চোখ খুলেছে।
কি আশ্চর্য্য! মানুষের মধ্যে এখনও কত কুসংস্কার আর অজ্ঞতা। বাঃ এই সুযোগে খুদে বেশ এক ঠোঙ্গা ঝাল মুড়ি ঝেপে দিলে!

বিশেষ রচনা

সমুদ্রের সম্পদ

সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়

বহুধাতবীয় নুড়ি তোলা

সমুদ্র মানুষের বহুভাবে উপকারে আসে। তাকে সে নানাভাবে ব্যবহার করে। নিজের বিভিন্ন কাজে সে তার বুকে ভেসে বেড়ায়। তার জল ও সাগরগর্ভ থেকে অনেক রকমের সম্পদ সে আহরণ করে। এই সম্পদকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। তারা হল মণিক সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ ও শক্তি উৎপাদনকারী সম্পদ। আজ আমাদের আলোচনা একটি বিশেষ মণিকসম্পদের উপর। তার নাম বহুধাতবীয় নুড়ি।

সমুদ্রের তলায় বহুধাতবীয় নুড়ির (একে শুধু নুড়ি বলে উল্লেখ করব) অবস্থিতি জানার বয়স একশ বছরের বেশি হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ড থেকে ডুবোযান চ্যালেঞ্জারের সাগর পরিক্রমাকালে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা সাগরের অনেক গভীরে থাকে বলে বহুদিন এদের সম্বন্ধে তেমন কৌতূহল জাগেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে স্থলের সম্পদ কমে আসায় এবং প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি হওয়ায় গত দু দশক ধরে এদের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। নুড়ির রাসায়নিক বিশ্লেষণও করা গেছে। কিভাবে সাগরগর্ভ থেকে তাকে তোলা যায়, তার প্রযুক্তি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

সাধারণতঃ সাগরের 1000 থেকে 6000 মিটার গভীরতায় এই নুড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। অল্প কয়েকটি জায়গায় অবশ্য কম গভীরতায় এদের দেখতে পাওয়া গেছে। এরা সাগরগর্ভে বেছানো থাকে, কিংবা সাগরতল নরম হলে সেখানে গেঁথে থাকে। এক বর্গমিটারে 5 থেকে 20টা নুড়ি পাওয়া যায়। কোন কোন এলাকায় স্তরের 83 শতাংশ নুড়ি থাকে। এদের ওজন কয়েক গ্রাম থেকে 40 কিলোগ্রাম অবধি হতে পারে। আজ অবধি সবচেয়ে বড় যে নুড়ি পাওয়া গেছে তার ওজন 850 কিলোগ্রাম।

এদের রঙ খয়েরী থেকে কালো হতে পারে। আকারে এরা গোল বা ডিমের মত। কখনো কখনো দুটো বা তার চেয়ে বেশিসংখ্যক নুড়ি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বড় নুড়ি তৈরি হয়। তাই এদের আকৃতি ভিন্ন রকমের হয়। এদের গা মসৃণ এবং পাউডার জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা। এর ভেতরটা ফুটোয় ভরা। এক একটা নুড়ির ব্যাস কয়েক মিলিমিটার থেকে 10 মিলিমিটার অবধি হতে পারে। ভারত মহাসাগরে এই নুড়ির আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·72। এর

ভেতরে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণের সঠিক মাপ নেই। সাগরের এক এক স্থানে এদের এক এক রকমের মাপ হয়। তবে সব জায়গাতেই ম্যাঙ্গা নজ ও লোহার পরিমাণ বেশি হয়। এতে কম পরিমাণে কোবাল্ট, নিকেল ও তামা পাওয়া যায়—0·1 থেকে 1 শতাংশের মত। নুড়িতে ধাতুর পরিমাণ সাগরের গভীরতার উপর নির্ভর করে। নুড়ির ভেতর অল্প পরিমাণে আর যে সব ধাতু পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আছে সীসা, দস্তা, ক্রোমিয়াম, টাইটানিয়াম, ফসফরাস, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

ম্যাঙ্গানিজ যে দেশে পাওয়া যায় না ; এই নুড়ি তুলে তারা তাদের অভাব পূরণ করতে পারবে। কিন্তু কম পরিমাণে হলেও এতে কোবাল্ট ও নিকেল আছে বলে এর দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে বছরে 500 টন নিকেল ও 0000 টন কোবাল্ট ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের সাগরগর্ভের উপরের 1 মিটারেই নুড়ি থেকে উপরোক্ত সংখ্যার 50000 গুণ নিকেল ও 100000 গুণ কোবাল্ট পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সারা পৃথিবীর সমুদ্রে আনুমানিক 3×10^{11} টন নুড়ি পাওয়া যেতে পারে। অনুমান করা হচ্ছে এর 50 শতাংশ প্রশান্ত মহাসাগরের ক্লারিয়ন-ক্লিপটারটন অববাহিকায়, 25 শতাংশ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, আর বাদবাকি 25 শতাংশ আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে সমভাবে অবস্থিত। ভারতের কাছাকাছি যে সব এলাকায় এদের পাওয়া গেছে তারা হল কেন্দ্রীয় ভারতীয় অববাহিকা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয় অববাহিকা, দক্ষিণ পশ্চিম আরব সাগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগর ও মালাগাসির কাছাকাছি সামুদ্রিক এলাকা। ভারতের সমুদ্রতট থেকে এদের সকলেরই দূরত্ব 3000 থেকে 3500 মাইল। উপরের হিসেব যে একেবারে সঠিক তা হলফ করে বলা যায় না। পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর সমস্ত অংশে বিশদভাবে অনুসন্ধান চালানো সময়সাপেক্ষ, বিশেষ করে উত্তোলনপর্ব এখনও যখন শুরু হয়নি, তাই আরও ব্যাপকভাবে জরিপ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করা হলে বিভিন্ন মহাসাগরে নুড়ির অবস্থানের চিত্র পাল্টে যেতে পারে। সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের প্রায় শ'খানেক স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখান থেকে মাসে 2·5 লক্ষ টন নুড়ি তোলা সম্ভব হতে পারে। গত দুদশক ধরে আটটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নুড়ি তোলার প্রযুক্তি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

সাগরগর্ভ থেকে নুড়ি উত্তোলনে পর্যায়ক্রমে যে কাজগুলো করতে হয় তা হল সাগরগর্ভে নুড়ি সংগ্রহ করা, তাকে জলস্তরে ওঠানো, সেখানে তাকে মজুত করে রাখা, তারপর তাকে নুড়িবাহক জাহাজে পাঠানো এবং সবশেষে তাকে তীরে নিয়ে আসা।

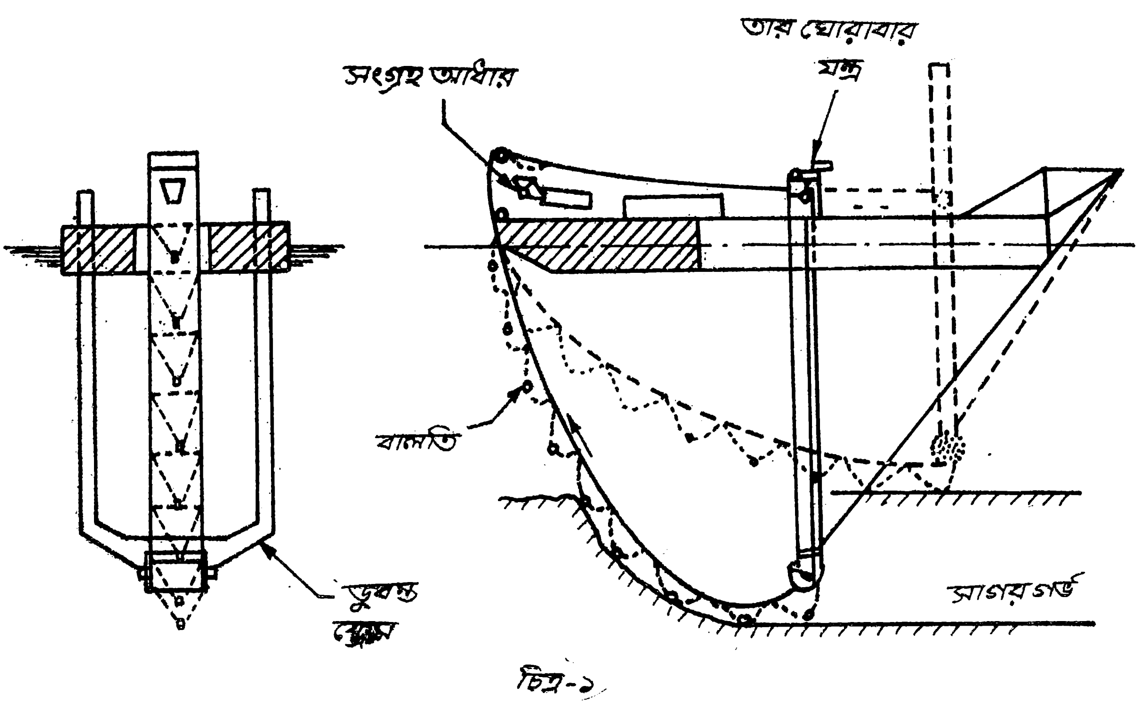

চিত্র-১

অগভীর জল ও গভীর জল থেকে নুড়ি তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গভীর জলে বিশেষ জলযান ব্যবহার করা হয়। উভয়ক্ষেত্রই সাগরতল ড্রেজ (dredge) করে নুড়ি সংগ্রহ করা হয়।

অগভীর জলে জাহাজে একটা ফ্রেমের (frame) সংগে তার ঝোলানো থাকে ক্যাটিনারীর (catenary) মত। আর এই তারে পর পর বালতি আটকানো থাকে। তার ঘোরাতে থাকলে বালতি উপর থেকে নিচে এসে সাগরতল স্পর্শ করে নুড়ি ভরে নিয়ে উপরে উঠে আসে (চিত্র নং 1)। বেশি নুড়ি যাতে সংগ্রহ করা যায়, তাই একবারে একটার বদলে অনেকগুলো বালতি যাতে সমুদ্রগর্ভ স্পর্শ করে, সেরকম ফ্রেম ইদানীং ডিজাইন করা হয়েছে।

গভীর জলে নুড়ি খননের জন্য আজ অবধি তিনটে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তারা হল ঃ (1) পাইপ উত্তোলন পদ্ধতি, (2) ক্রমাগত বালতি উত্তোলন পদ্ধতি এবং (3) খননের শ্যাটল (shutile) ব্যবস্থা।

পাইপ উত্তোলন পদ্ধতি ঃ

সাগরখনন জাহাজের সাহায্যে এক্ষেত্রে নুড়ি সংগ্রহ করা হয়। এই জাহাজ থেকে একটা বিশাল পাইপ সাগরতলে গিয়ে পৌঁছয়। পাইপের বিভিন্ন অংশে পাম্প লাগানো

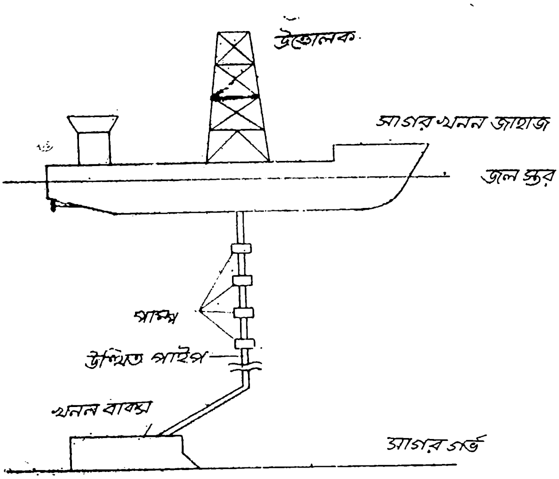

চিত্র-২

থাকে। পাইপের শেষ অংশের সংগে একটা নমনীয় পাইপ (হোস পাইপের মত) লাগানো থাকে। এর সংগে যুক্ত থাকে সাগরতলে রাখা একটা খনন বাক্স (চিত্র নং 2)।

খনন বাক্সের ভেতর ইলেকট্রিক মোটর, পাম্প ইত্যাদি থাকে বলে তা যথেষ্ট ভারী হয়। যাতে সে সাগরগর্ভের নরম মাটিতে বসে না যায়, তাই তার সংগে প্লবতা ট্যাঙ্ক যুক্ত থাকে। এই খনন বাক্স সাগরতল ঝেঁটিয়ে চলে। এর ফলে নুড়ি এই বাক্সে জমা হয়। তাকে জলের উচ্চচাপে ধুয়ে ফেলে একটা পর্দার ভেতর দিয়ে পাঠানো হয়। বিশেষ আকারের থেকে ছোট নুড়ি এই পর্দার ভেতর গিয়ে একটা কক্ষে জমা হয়। বড় আকারের নুড়িগুলো পর্দায় আটকে যায়। কক্ষে জমা নুড়িগুলো নমনীয় সাকসান (suction) পাইপ দিয়ে উত্থিত পাইপে যায়। সেখান থেকে তাকে পাম্প করে জাহাজে পাঠানো হয়। সাকসান পাইপের দৈর্ঘ্য 10 থেকে 20 মিটার হয়। উত্থিত পাইপের ব্যাস 10 সেন্টিমিটার থেকে 60 সেন্টিমিটার হতে পারে। এই পাইপের বিভিন্ন অংশে পাম্প লাগানো থাকে।

উত্থিত পাইপের অংশগুলো পাটাতনে রেখে জাহাজকে নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়ে আসা হয়। উত্তোলকের সাহায্যে তেল খননের জন্য ড্রিল পাইপের যেভাবে সংযোগ ঘটানো হয়, একই পদ্ধতি আরোপ করা হয় উত্থিত পাইপের ক্ষেত্রে। এই জাহাজের দুলুনিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যন্ত্রপাতি সেখানে থাকে। একটা নির্দিষ্ট বেগে জাহাজকে চলতে হয় নুড়ি তোলার জন্য।

এই পদ্ধতিতে সমুদ্রগর্ভ উঁচুনিচু হলে পাইপে হেঁচকা লাগতে পারে। ক্রমাগত নুড়ির সংগে পাইপের ঘর্ষণে পাইপ ক্ষয়ে যেতে পারে। আর একটা বড় অসুবিধে হল এই যে এর কোন একটা অংশ খারাপ হয়ে গেলে পুরো উত্তোলনপর্ব বন্ধ রাখতে হবে।

ক্রমাগত বালতি উত্তোলন পদ্ধতি ঃ

এই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ। জাহাজের দুই প্রান্ত থেকে শক্ত দড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়। দড়ির গায়ে সারি সারি বালতি আটকানো থাকে। দড়ি ক্রমান্বয়ে ঘোরার ফলে এক একটা বালতি সমুদ্রতল স্পর্শ করে নুড়ি ভরে নেয় (চিত্র নং 3)। দড়িকে বালতি ও নুড়ির ওজন বইতে হয় বলে যথেষ্ট শক্ত হতে হয়। পলিপ্রোপিলিনের দড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ব্যবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ। সাগরগর্ভ উঁচুনিচু হলেও কিছু এসে যায় না। এই পদ্ধতিতে সমুদ্র কিছুটা বিক্ষুব্ধ হলেও কাজ চালানো যেতে পারে। এর সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল দড়ির জট পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা। এটা এড়াবার জন্য দড়ির দু প্রান্তের দৈর্ঘ্য খুব বেশি হওয়া দরকার অর্থাৎ জাহাজকে যথেষ্ট লম্বা হতে হবে। কখনো বা দুটো জাহাজের সাহায্যে খননকার্য চালানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দড়ির দু প্রান্ত দুটো জাহাজে থাকবে, আর তাদের দূরত্ব হবে কম করে 1 কিলোমিটার।

খনন শ্যাটেল পদ্ধতি ঃ

খনন শ্যাটেল সমুদ্রের ভেতর ওঠানামা করে। সমুদ্রের

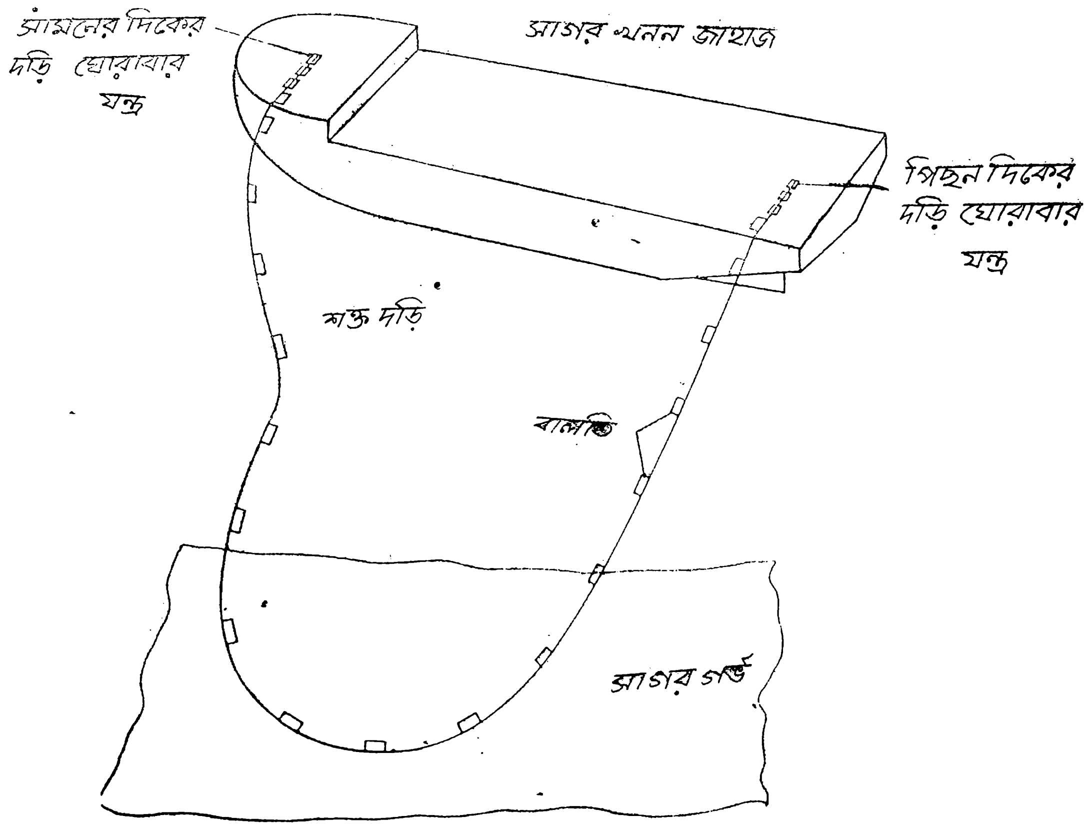

চিত্র-৩

জলের ভেতর প্রবেশের জন্য এর সংগে ওজন লাগানো থাকে। এরা সাগরতলে গিয়ে খনন শুরু করলে এই ওজন খুলে পড়ে যায়। এরা নুড়ি নিয়ে উপরে উঠে আসে। এই ব্যবস্থায় খুবই উন্নত যন্ত্রপাতি লাগে। এ খুব ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তাই এ পদ্ধতি খুব আগ্রহ সৃষ্টি করেনি।

সাগরখনন জাহাজে নুড়ি সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা রাখতে হয়। সাগরগর্ভের নুড়ি উপরে উঠিয়ে এনে প্রথমে জাহাজে মজুত করে রাখা হয়। সেখান থেকে তাকে নুড়িবাহক জাহাজে পাঠানো হয়। সমুদ্রের ভেতর দুটো জাহাজের মধ্যে নুড়ি আদানপ্রদান করা কিন্তু খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বা কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে নুড়ি এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে পাঠানো যেতে পারে। নুড়ি দিয়ে জাহাজ ভর্তি করতে বেশ কয়েকদিন লেগে যেতে পারে।

গভীর সমুদ্র সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। নুড়ি উত্তোলন "সমুদ্রের আইন" দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই আইনের বলে 1995 সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নুড়ি উৎপাদন শুরু হবে। অর্থকরী দিক থেকে দেখা গেছে যে, যে-দেশ বা সংস্থা নুড়ি তোলার জন্য সাগরের এলাকা বেছে নেবে সেখানে অন্ততঃ 15000 বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে নুড়ি থাকা দরকার। হিসেব মত প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যদি 20 কিলোগ্রাম নুড়ি মেলে, তবে সেখানে 6 কোটি টন নুড়ি পাওয়া যাবে। নুড়ি থেকে ধাতুগুলো আলাদা করার প্রক্রিয়া খুবই জটিল। এটা প্রচুর ব্যয়বহুলও বটে। তাছাড়া নুড়ি তোলার প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। যথেষ্ট সংখ্যক নুড়ি না পাওয়া গেলে বাণিজ্যিক সাফল্য মিলবে না। তাই মনে হয় নুড়ি তোলাকে উপযুক্তভাবে কার্যকরী করে তুলতে আরও কিছু বছর সময় লাগবে।

ডিপার্টমেন্ট অব ন্যাভাল আর্কিটেকচার, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি ; খড়্গপুর 721302 মেদিনীপুর।

বিজ্ঞানের ডায়েরী' অক্টোবর

বিমান বসু

2 অক্টোবর, 1861, বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ **নীলরতন** সরকার এইদিন ডায়মণ্ড হারবারের কাছে নেতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 1876 সালে জয়নগর স্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর 1879 সালে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে

'ভার্নাকুলার ডিপ্লোমা' অর্জন করেন। তারপর 18৮8 সালে এম. বি. এবং 1890 সালে এম. ডি. পাশ করে ডাক্তারি শুরু করেন। 1895 সালে তাঁরই চেষ্টায় কলকাতায় কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জনস্ (College of Physicians & Surgeons) স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ঐ প্রতিষ্ঠানটিই ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে আর জি কর.) নামে খ্যাত হয়।

নীলরতন সরকার একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ্ও ছিলেন। 1919 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। 1933 থেকে 1941 সাল পর্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর সভাপতি ছিলেন। 1918 সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। 1943 সালের 18মে বিহারের গিরিডিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

4 অক্টোবর, 1957, এই দিন মানুষের তৈরি **প্রথম উপগ্রহ** 'স্পুতনিক্-1' কে মহাকাশে ছাড়া হয়। 85 সেণ্টিমিটার ব্যাসযুক্ত এবং 83 কিলোগ্রাম ওজনের অ্যালুমিনিয়ম ধাতুর তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহটিকে একটি সোভিয়েত রকেটের

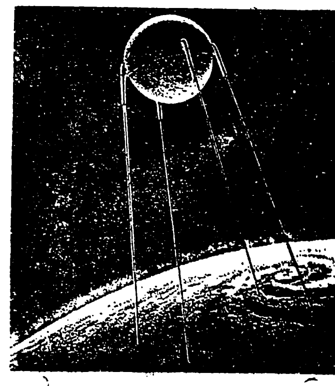

4 অক্টোবর 1957 "স্পুতনিক-1"

সাহায্যে পৃথিবীর চারপাশে 215-940 কিলোমিটার উচ্চতার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। উপগ্রহটি 21 দিন ধরে রেডিও সংকেত পাঠিয়েছিল।

6 অক্টোবর, 1893 এই দিন ঢাকা জেলার শেওড়াতালী গ্রামে বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা জন্মগ্রহণ করেন। সিমুলিয়া মধ্য ইংরেজী স্কুলে ছাত্রজীবন শুরু করেন। তারপর 1915 সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফলিত গণিতে এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। 1917 সালে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হওয়ার পর গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 1919 সালে ডি. এস-সি. এবং 1920 সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। 1920 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কার 'তাপীয় আয়নবাদ' (Theory of Thermal Conization) যার ভিত্তিতে সর্বপ্রথম সূর্য ও নক্ষত্রের গঠন পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া

স্তরে একাধিক ইলেক্ট্রন ও মেসন (meson) কণিকার সৃষ্টি হয়। এই গবেষণার জন্য 1941 সালে তাঁকে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

তারই প্রচেষ্টায় 1945 সালে বোম্বাইয়ে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর 1948 সালে যখন ভারতের আণবিক শক্তি কমিশন স্থাপিত হয় তখন ভাবা তার প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে দেশের প্রথম কয়েকটি পারমাণবিক চুল্লী, যেমন 'অপ্সরা', 'সাইরাস' ও 'জারলিনা' ইত্যাদি নির্মিত হয়। দেশে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এক দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্পও তিনি তৈরি করেছিলেন যার রূপায়ণ আজ আমরা দেখছি। 1966 সালের 24 জানুয়ারি ইউরোপের মণ্ট ব্যাঙ্ক পাহাড়ের ওপর এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নভেম্বর

2 নভেম্বর 1833, এই দিন পশ্চিম বঙ্গে হাওড়ার প্রায় 30 কিলোমিটার পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে বিজ্ঞানাচার্য মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম হয়। 1860 সালে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল. এম. এস. (Licentiate in Medicine and Surgery) ডিগ্রী লাভ করেন এবং এর তিন বছর পর এম. ডি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতেই চিকিৎসা চালিয়ে যান কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে সেটাই চিকিৎসার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

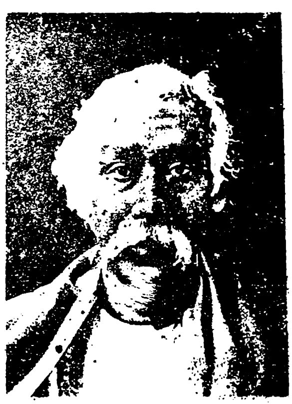

ভারতে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে মহেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড় অবদান কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর স্থাপনা। তাঁরই প্রচেষ্টায় 1876 সালের 15 জানুয়ারি ঐ প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক স্থাপনা হয়। 1904 সালের 23 ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

3 নভেম্বর 1892, এই দিন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের লা পোর্তা (La Porte শহরে বিশ্বের প্রথম স্বয়ংচালিত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু হয়।

5 নভেম্বর 1892, এই দিন ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ডে প্রাণিবিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যাল্ডেন্ (J. B. S. Haldane) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জন স্কট হ্যাল্ডেন্ও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর কাছেই খুব ছোট বয়সে জে. বি. এস. এর বিজ্ঞানে হাতে খড়ি হয়। মাত্র আট বছর বয়স থেকেই তিনি তাঁর বাবাকে গবেষণায় সাহায্য করতে শুরু করেন। এমন কি ছোটবেলা থেকেই শারীরবৃত্ত নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক সময় তিনি নিজের শরীরের ওপরেই চালাতেন।

প্রজনন বিদ্যার অধ্যয়নে গাণিতিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে তিনিই সর্বপ্রথম প্রজনন বিদ্যা ও জীবের ক্রমবিকাশের মধ্যে যে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে তা দেখিয়ে দেন। জৈব রসায়নের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন। তাছাড়া, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, সৃষ্টি তত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন।

1957 সালে তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন। প্রথমে কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেন এবং তারপর 1962 সাল থেকে 1964 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভুবনেশ্বরে জেনেটিক্স্ অ্যাণ্ড বায়োমেট্রি ল্যাবরেটরি'র ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারেও হ্যালডেন যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহু জনপ্রিয় বই লিখে গেছেন।

7 নভেম্বর 1888, ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন এই দিন দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ালটেয়ারে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. ও এম. এ. পাশ করেন। তারপর সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় সরকারের অর্থদপ্তরে 'ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল' পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ঝোঁক কোনও দিনও কমে নি। সে সময়েই কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স'র সম্পাদক ডঃ অমৃতলাল সরকার রমনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁর গবেষণার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেন। 1917 সালে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনার পর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে রমন পদার্থ বিদ্যার প্রথম 'পালিত অধ্যাপক' এর পদ গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে গবেষণা চালিয়েই 1928 সালে রমন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করেন। ঐ আবিষ্কারের জন্য 1930 সালে তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি রয়্যাল সোসাইটিরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

1933 সালে রমন কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স' এর ডিরেক্টর পদে চলে আসেন। 1943 সালে তিনি ব্যাঙ্গালোরেই 'রমন ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। 1970 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন।

8 নভেম্বর 1895, এই দিন জার্মানীর উর্জবুর্গ (Wurzburg) শহরে উইলহেল্‌ম্ রন্টগেন (Wilhelm Raentgen) এক্স-রে আবিষ্কার করেন। অন্ধকার ঘরে ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় আকস্মিক ভাবেই তিনি ঐ আবিষ্কার করেন। ক্যাথোড নল থেকে বেরিয়ে আসা এক্স-রশ্মির প্রভাবে মোটা বইএর ভেতরে রাখা একটি চাবির ছায়া ঐ বই তলায় রাখা বাক্সবন্ধ কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফিক প্লেটে ফুটে উঠেছিল যা থেকে সর্বপ্রথম ঐ অদৃশ্য রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায়।

13 নভেম্বর 1907, এই দিন বিশ্বের সর্বপ্রথম হেলিকপ্টারটি ফ্রান্সের Lisieux'এ আকাশে ওড়ে। দুই পাখাযুক্ত হেলিকপ্টারটি Paul cornu নামক এক সাইকেল বিক্রেতা তৈরি করেছিলেন। প্রথম বার হেলিকপ্টারটি মাটি থেকে প্রায় 2 মিটার ওপরে প্রায় 20 সেকেণ্ড উড়েছিল।

14 নভেম্বর 1891, ভারতের খ্যাতনামা প্রত্ন উদ্ভিদবিদ্ (Palaeobotanist) বীরবল সাহনী এই দিন পাঞ্জাবের ভেরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 1911 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর 1919 সালে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. উপাধি পান। 1929 সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। 1936 সালে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন।

বীরবল সাহনীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি সেখানে উদ্ভিদ বিদ্যার ও ভূতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌ'এ বিশ্বের প্রথম 'প্যালিওবোটানি ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হয় যেখানে জীবাশ্ম বা ফসিলে প্রাপ্ত পরাগরেণুর অনুশীলন করে তা থেকে পৃথিবীর প্রাচীন

জলবায়ু, উদ্ভিদ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। 1949 সালে 10 এপ্রিল লক্ষ্ণৌ'এ তাঁর মৃত্যু হয়।

17 নভেম্বর 1970, এই দিন চাঁদের ওপর প্রথম মানব-রহিত গাড়ি, আটচাকাযুক্ত 'লুনোখোদ-1'কে চালানো হয়। গাড়িটিকে 'লুনা-17' চন্দ্রযানে করে সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চাঁদে নামিয়েছিলেন এবং পৃথিবী থেকে বেতার সংকেতের সাহায্যে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

20 নভেম্বর 1980, ভারতে তৈরি উপগ্রহ 'ভাস্কর-2' কে এই দিন একটি সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে মহাকাশে ছাড়া হয়। উপগ্রহটিতে ভূপৃষ্ঠের অধ্যয়নের জন্য বিশেষ ক্যামেরা লাগানো ছিল।

21 নভেম্বর 1783, এই দিন গরম হাওয়া ভর্তি 'মণ্টগল্‌ফিয়ে' বেলুনে চড়ে মানুষপ্রথম আকাশে ওড়ে।

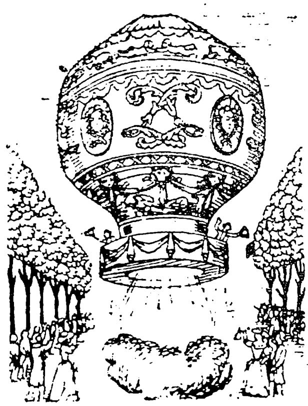

যাত্রী ছিলেন দু'জন ফরাসী পুরুষ। এর আগে কেবল মাত্র হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বেলুন ব্যবহার করা হতো। হাইড্রোজেন দাহ্য পদার্থ বলে ঐ ধরনের বেলুন খুবই বিপজ্জনক ছিল।

23 নভেম্বর 1935, এই দিন আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে এক রাত্রি ভোজের সময় সর্বপ্রথম ফ্লোরেসেণ্ট আলো (fluorescent lighting) ব্যবহার করা হয়। উপলক্ষ্যটি ছিল মার্কিন পেটেণ্ট অফিসের শতাব্দী সমারোহ।

23 নভেম্বর 1937, এই দিন গিরিডিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়।

30 নভেম্বর 1858, এই দিন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাড়িখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। 1880 সালে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি এ. পাশ করার পর বিদেশ

যাত্রা করেন। প্রথমে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ট্রাইপস্‌ এবং তারপর 1885 সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই সময়েই তিনি গবেষণা চালিয়ে বিনা তারে বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণের উপায় আবিষ্কার করেন। তাছাড়া অতি সূক্ষ্ম (5-25 মিলি-মিটার) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ উৎপাদন ও তা বিনা তারে প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও তিনিই সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলেন। 1896 সালে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে ডি এস-সি, উপাধি দেন।

বিভিন্ন ধরনের বেতার গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময়েই জগদীশচন্দ্র প্রথমে লক্ষ করেন যে জীবের মত জড় পদার্থও উত্তেজনা এবং বিদ্যুৎস্পর্শে সাড়া দেয়। বার-বার সংকোচনের ফলে তাদেরও ক্লান্তি আসে, আবার বিশ্রামের পর তারা পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাঁর এই আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণা প্রমাণ দেয় যে প্রাণীদের মত উদ্ভিদও একই ভাবে উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তিনি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া মাপবার জন্য এমন সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন যাতে সামান্য কোনও পরিবর্তনও

প্রায় দশলক্ষ গুণ বেড়ে ধরা পড়ে। ক্রেস্কোগ্রাফ নামক ঐ যন্ত্র ব্যবহার করে তিনি উদ্ভিদের ওপর স্পর্শ, আঘাত, তাপ, বিভিন্ন উত্তেজক দ্রব্য এবং বিষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অধ্যয়ন চালান এবং উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেন। 1917 সালে কলকাতায় তাঁর বাসভবনের পাশেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের স্থাপনা হয়। সেখানে তার তৈরি বহু যন্ত্র আজও রাখা আছে। 1916 সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। 1920 সালে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। 1937 সালের 23 নভেম্বর বিহারের গিরিডিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

30 নভেম্বর 1917, এই দিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) তাঁর নিজের বাসভবনের পাশেই বসুবিজ্ঞান মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জগৎ বিখ্যাত ঐ গবেষণাগারটি গড়ে তুলতে জগদীশচন্দ্র তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন এবং স্থাপনার পর তিনি নিজেই এখানে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা চালিয়েছিলেন।

ডিসেম্বর

1 ডিসেম্বর 1964, এই দিন ভুবনেশ্বরে বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী জে বি. এস. হ্যাল্ডেন্ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল 71 বছর।

2 ডিসেম্বর 1982, এই দিন আমেরিকার সল্ট লেক সিটির এক হাসপাতালে মানুষের শরীরে সর্বপ্রথম প্লাস্টিকের তৈরি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড লাগানো হয়। 'জার্ভিক-7' (Jarvik-7) নামক বায়ুচালিত কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটি লাগানো হয়েছিল বার্নিক্লার্ক (Barneyc lark) নামক 61-বছর বয়স্ক এক অবসরপ্রাপ্ত দাঁতের ডাক্তারের দেহে ; তাঁর নিজের ব্যাধিগ্রস্ত হৃৎপিণ্ডের বদলে। ঐ কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ধারণ করে ক্লার্ক প্রায় চার মাস বেঁচে ছিলেন। 1983 সালের 23 মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

3 ডিসেম্বর 1967, এই দিন সর্বপ্রথম মানুষের শরীরে এক মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড রোপণ করা হয়। ডাক্তারটি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড (Christian Barnard), রোগীর নাম লুই ওয়াশ্‌কান্‌স্কি (Louis Washkansky)। হৃৎপিণ্ড রোপণের পর ওয়াশ্‌কান্‌স্কি মাত্র 18 দিন বেঁচে ছিলেন। 20 ডিসেম্বর নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

6 ডিসেম্বর 1877, এই দিন টমাস আলভা এডিসনের সদ্য আবিষ্কৃত ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে সর্বপ্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয়। এডিসন নিজেই "Mary hade a little lamb" ছড়াটি আবৃত্তি করে রেকর্ড করেছিলেন।

10 ডিসেম্বর 1896, এই দিন ডাইনামাইট আবিষ্কারক এবং নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেড নোবেল (Alfred Nobel) 63 বছর বয়সে ইতালীর 'সান্ রেমো'তে পরলোক গমন করেন।

10 ডিসেম্বর 190 , এই দিন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পদার্থবিজ্ঞানে জার্মানীর উইল্‌হেল্‌ম্ রণ্টগেন, রসায়নে হল্যাণ্ডের জ্যাকোবাস ভ্যাণ্ট হফ্ (Jacobus Van't Hoff) এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে জার্মানীর এমিল ফন বেরিং (Emil Von Behring) কে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়।

15 ডিসেম্বর 1970, এইদিন সোভিয়েত গ্রহযান 'ভেনেরা-7' শুক্রগ্রহে অবতরণ করেও তথ্য পাঠায়।

17 ডিসেম্বর 1903, এইদিন আবিষ্কারক অরভিল রাইট (Orville Wright) কে নিয়ে প্রথম ইঞ্জিন যুক্ত এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে। 'ফ্লাইয়ার-1'

নামক 12 হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিনযুক্ত দু'ডানাওয়ালা প্লেনটি সকাল 10'35 মিনিটে প্রথমবার আমেরিকার কিটিহক (Kittihawk) এ মাটি থেকে 3-4 মিটার ওপর দিয়ে উড়ে

প্রায় 94 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। সময় লেগেছিল মাত্র 2 সেকেণ্ড। সেদিনই বিকেলে অরভিলের ভাই উইলবার (Wilbur) ঐ প্লেনে চড়েই 285 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। সময় লেগেছিল 59 সেকেণ্ড।

20 ডিসেম্বর 1967, বিশ্বের প্রথম হৃৎপিণ্ডরোপিত ব্যক্তি লুই ওয়াশকানস্কি'র মৃত্যু হয়।

22 ডিসেম্বর 1887, বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ শ্রীনিবাস রামানুজম এই দিন দক্ষিণ ভারতের ইরোদ (Erode) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট-

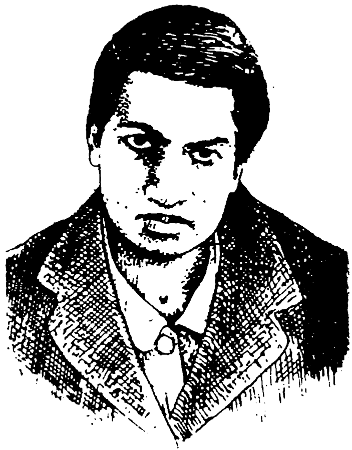

বেলা থেকেই অঙ্কে অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কে প্রথম ডিভিশন পেয়ে পাশ করে বৃত্তি লাভ করা সত্ত্বেও কলেজের প্রথম বছরের পরীক্ষায় ফেল করেন কারণ ইতিহাস, ইংরেজী ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্ট-এর অফিসে কেরানীর চাকরি পান। কিন্তু তাঁর অঙ্কের নেশা তাঁকে তখনও ছাড়েনি। অবশেষে ইংলণ্ডের বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ জি. এইচ. হার্ডি (G. H. Hardy) তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংখ্যাতত্ত্ব, অমৌলিক সংখ্যা, বীজগণিত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। 1918 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। সেবছরই ডিসেম্বরে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের প্রথম ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হন। দেশে ফেরার পর 1920 সালের 26 এপ্রিল মাত্র 33 বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

25 ডিসেম্বর 1642, এই দিন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন Isaac Newton ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি 1665 সালে কেম্ব্রিজ থেকে বি. এ. পাশ করেন তখনই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 1687-89 সালে প্রকাশিত তাঁর তিন-খণ্ডের 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) গ্রন্থে তিনি তাঁর বিখ্যাত তিনটি গতিসূত্র (Laws of Motion)এবং মহাকর্ষ সূত্রের (Law of Universal Gravitation) ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 1703 সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। দীর্ঘ 24 বছর তিনি ঐ পদে ছিলেন। 1705 সালে তাকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়। 1727 সালে, 85 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

27 ডিসেম্বর 1822, এই দিন পূর্ব ফ্রান্সের একটি ছোট গ্রামে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)' এর জন্ম হয়। 1856 সালে গাঁজনক্রিয়া (Fermentation) নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং আবিষ্কার করেন যে সব রকম গাঁজনক্রিয়ার মূলেই রয়েছে কোনও জীবাণু। তাপ দিয়ে ঐ জীবাণু নষ্ট করে দিলে আর গাঁজনক্রিয়া সম্ভব হয় না। তার গবেষণার ভিত্তিতেই দুধের 'পাস্তুরিকরণ' পদ্ধতি চালু হয় যাতে করে দুধকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাজা রাখা সম্ভব।

1888 সালে প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউট স্থাপনার পর তিনি তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং 1895 সালে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন।

31 ডিসেম্বর 1901, এই দিন ইংল্যাণ্ডের কর্নওয়াল (Carnwall) এবং কানাডার নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড (Newfoundland) এর মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে প্রথম বেতার টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠানো হয়।

7, ইউ. এফ. কলেজ রোড, নিউদিল্লী-1

1879 সালের 31 ডিসেম্বরের রাতে একটি স্পেশ্যাল ট্রেন আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে নিউইয়র্ক মেনলো পার্কে আসে। রেল কোম্পানীকে শুধু ঐ দিনটাই নয় বেশ কয়েকদিন ধরে ঐ ট্রেন চালাতে হয়েছিল অসংখ্য যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্যে যারা এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে চেয়েছিল নিজের চোখে। বিস্ময় উদ্রেককারী বস্তুটি হচ্ছে—এডিসনের ভাস্বরদীপ।

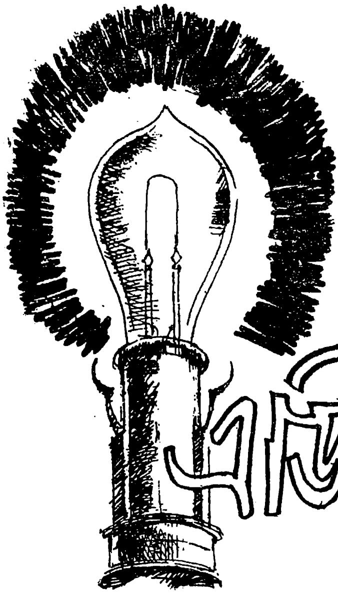

এডিসনের ভাস্বরদীপ

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

আমেরিকান সাংবাদিক মার্শাল ফক্সও অন্য সব সাংবাদিকের মত চাঞ্চল্যকর সংবাদের খোঁজে যে ঘুরে বেড়াবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। টমাস নামে তাঁর এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু ছিলেন। আর সেই বন্ধুটির প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি শুধু নিঃসন্দেহই নন—তাঁর ব্যাপারে তিনি ছিলেন রীতিমত মুখর। নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকার জন্যে তিনি টমাসের কাজের ওপর একটি বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করলেন। ভেবেছিলেন এ-ব্যাপারে অন্য পত্র-পত্রিকার ওপর বেশ একটা টেক্কা মারতে পারবেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে ঘটল একেবারে উল্টোটা। খবরটা ছেপে বের হওয়ায় মার্শাল ফক্স তাঁর সাধের চাকরিটি খোয়াতে বসেছিলেন আর কি। সংবাদটা পড়ে পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর থমাস কোনেরি তো রেগে আগুন। সম্পাদকের নাকের ডগার ওপর কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এ-সব কি ছাইপাঁশ ছাপা হচ্ছে আমার কাগজে, অ্যাঁ? তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ? ছেলেমানুষি হচ্ছে? হেরাল্ডকে নিয়ে লোকে যে ঠাট্টা করবে এরপর। আর আমি কি বলব ওপরঅলাকে?

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসনের একটি অভিনব বস্তুর প্রদর্শনীকে উপলক্ষ্য করে। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে এডিসন সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া যাক। এডিসন বিস্ময়কর সব জিনিস উদ্ভাবন করেছিলেন অথচ তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। মিলান শহরে 1847 সালের 11 ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর জন্ম। জীবনের শুরুতেই শাকসব্জির হকারি করতে নামেন রেলে। বারো বছর বয়সে করেন খবরের কাগজের হকারি। তারপর খবরের কাগজ ছাপিয়ে বিক্রি করতে থাকেন। আর ঐ সময়েই কেমিস্ট্রির প্রতি আকৃষ্ট হন। রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। 186৪ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে এডিসন একটি বৈদ্যুতিক ভোটগণনা যন্ত্র পেটেন্ট করান!

এডিসন ফোনোগ্রাফ সমেত অনেক কিছুই উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করেই আজকের সিনেমা বা চলচ্চিত্রের সূচনা। তবু এডিসন বলতে আমরা বৈদ্যুতিক বাতির কথাই প্রথমে ভাবি। 1840 সালে ইংল্যাণ্ডে প্লাটিনাম ব্যবহার করে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়। কিন্তু সেই বাতি ছিল ব্যবহারের অনুপযুক্ত। ব্যাপারটা নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাবছিলেন এডিসন। 1৪78 সালে তিনি এই বিষয়ে বড় রকমের কাজ শুরু করেন। বাতির ক্ষেত্রে সমস্যা হল ফিলামেন্টকে নিয়ে। তিনি কার্বন থেকে শুরু

করে অনেক কিছু নিয়েই পরীক্ষা করলেন কিন্তু কোনটাই কোন কাজে লাগল না। এখন আবার সেই প্লাটিনামেই ফিরে এলেন। কিন্তু প্লাটিনাম কি সহজে পাওয়া যায়?

যাই হোক 1878 সালের অক্টোবর মাসে এডিসন তাঁর বাতির জন্যে পেটেন্টের আবেদন করলেন। এদিকে টাকা জলের মত খরচ হয়ে যেতে লাগল। আরও টাকা চাই গবেষণার জন্যে। না, টাকার অভাব হল না। একদল মানুষ এগিয়ে এল এই নবীন গবেষককে সাহায্যের জন্যে। এডিসনও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চললেন। দিন নেই, রাত নেই পরীক্ষাগারে তিনি কাজ করে চলেছেন। সারা দিনে ঘুমোন বড় জোর চার ঘণ্টা।

1879 সালের এপ্রিলে এডিসন অনেকগুলো পেটেন্টের আবেদন করলেন—বাতির সেই ফিলাফেণ্ট অবশ্যই ছিল প্লাটিনামের। প্লাটিনাম নিয়ে কাজ করা আর হাতি পোষা প্রায় একই ব্যাপার। এডিসন তাই ভাবলেন নিকেলকে ফিলামেণ্ট হিসাবে ব্যবহার করলে কেমন হয়? না, তাও সার্থক হল না। অগত্যা বৈদ্যুতিক বাতির প্রসঙ্গটি বাতিল করে সাময়িকভাবে অন্য গবেষণায় মন দিতে চাইলেন। প্রতিভাবান এডিসনের গুণমুগ্ধের কখনও অভাব হয় নি, অভাব হয় নি হিতৈষীরও। তাঁর মনের এই হতাশ অবস্থায় তারা শুধু এগিয়ে এসে অর্থই জোগায় নি, দিয়েছে প্রেরণাও। তাই ঐ বছরের পাতা-ঝরা হেমন্তে আবার তিনি নতুন করে ভাস্বরদীপ নিয়ে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলেন।

এডিসন 1877-78 সালে উদ্ভাবন করেন কার্বন ট্রান্স-মিটার যার সাহায্যে শব্দতরঙ্গকে পরিবর্তী বৈদ্যুতিক সিগন্যালে এবং বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে আবার শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়। 1879 সালের হেমন্তের একদিনে তিনি কার্বন ট্রান্সমিটারের ওপর কাজ করছেন ল্যাব-এ তখন তাঁর মাথায় এল কার্বনকে আবার ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহার করার আইডিয়াটা। কার্বনের রোধ বেশি কিন্তু কার্বন রড্ উচ্চ ভাস্বরতায় বেশিক্ষণ টেঁকে না। এবার তাই তিনি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের কার্বন দিয়ে তৈরি জিনিসের ওপর পরীক্ষার কথা ভাবলেন। তাঁর এমন জিনিস চাই যার ব্যাস $\frac{1}{64}$ ইঞ্চির বেশি হবে না যা প্রায় ছ ইঞ্চি মত লম্বা হবে তার আকৃতিটা হবে অনেকটা ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত যাতে না কাচের গ্লোবটা বেশি বড় হয়ে যায়। সেলাইয়ের জন্যে যে তুলোর সুতো ব্যবহার করা হয় সেটা হলে কেমন হয়? কথাটা তাঁর হঠাৎ মাথায় এল। নড়ে চড়ে উঠলেন টমাস। তার মানে সেই পুরনো চিন্তার সূত্র ধরে কার্বনের ব্যাপারটা নতুন করে ফিরে আসছে। তা আসুক, ক্ষতি নেই। আবারো শুরু হল যাকে বলে সূত্রযজ্ঞ। আর সাধক যখন টমাস এডিসন তখন কী দুশ্চর সাধনা যে শুরু হল তা আর বলার নয়। একাজে তাঁর সহকারীর অবদানও বড় কম ছিল না। সুতোকে টুকরো করা তাতে কার্বন লাগান—এভাবেই চলতে থাকে সারাদিন। পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরাম নেই। বারবার ব্যর্থ হলেও কিন্তু হাল ছাড়েন না টমাস। অবশেষে একটি কার্বনলাগান সুতোকে বাল্বের মধ্যে ঢোকাতে পারলেন। জেনারেটারের তারের সঙ্গে বাল্বটা জুড়ে দেওয়া হল। তারপর বাল্বটাকে বায়ুশূন্য করে কারেণ্ট চালান হল। এবার ঘটল সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। আলোয় আলোয় চোখ গেল ধাঁধিয়ে। দীর্ঘ চল্লিশ ঘণ্টা ধরে জ্বলেছিল সেই বাতি। এডিসন তার পর কারেণ্টের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন ফিলামেণ্টের সহনশীলতা দেখার জন্যে। বাতির ভাস্বরতা বেড়ে গিয়ে পরমুহূর্তে গেল নিভে।

হেমন্তের সেই পাতাঝরা সকালে ক্লান্ত অবসন্ন এডিসন ফিরলেন বাড়িতে। হ্যাঁ, অবশেষে তাঁর জয় হয়েছে। হয়েছে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ভাস্বর-দীপের স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছে। এটাকেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে—কিন্তু সুতো দিয়ে সে-কাজ হবে না। অন্য কোন ফিলামেণ্টের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু সে অবকাশ কই? ঘুমে চোখ যে জড়িয়ে আসছে। এডিসন বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর শোয়ামাত্র ঘুম। চব্বিশ ঘণ্টার আগে সে ঘুম ভাঙে নি। যেদিন তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন সেই তারিখটা ছিল 1879 সালের 21 অক্টোবর।

আবার শুরু হল উপযুক্ত ফিলামেণ্টের অন্বেষণ। হাতের কাছে যা পেয়েছেন কাঠ, সেলুলয়েড এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর লাল দাড়ির চুল পর্যন্ত কার্বনাইজ করে তাকে ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। না, কিছুতেই আর মনঃপূত হয় না। কিন্তু পরীক্ষকের নাম যে টমাস আলভা এডিসন। তাই চেষ্টারও ত্রুটি থাকে না। শেষমেশ স্থির করলেন বিশেষ ধরনের কাগজকে ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহার করবেন—যা কিনা কয়েক শো ঘণ্টা ধরে জ্বলবে। পেপার ফিলামেণ্টের পেটেন্টের জন্যে আবেদন জানালেন 1879 সালের 4 নভেম্বর।

এডিসন তো ভাস্বরদীপ তৈরি করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ কি সে-কথা বিশ্বাস করল? বৈজ্ঞানিকদের সংশয় কিন্তু গেল না। ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু কাচের গোলকের মধ্যে কাগজের ফিলামেণ্ট জ্বলবে তাতে মহানগরী হবে আলোকিত এটাকে তাঁরা ভোজবাজির বেশি গুরুত্ব দিলেন না। সেদিনের বিজ্ঞানীমহলে মতভেদ ছিল এই

বাতির ব্যাপারে। কেউ বলতেন বাতির ব্যাপারটা শক্তির নিত্যতা সূত্রের পরিপন্থী অথচ একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এটা শক্তির রূপান্তরের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

যাই হোক, জেনারেটার বা বিদ্যুৎ উৎপাদকের ক্ষেত্রেও এডিসনের রয়েছে বিরাট অবদান। এ-ব্যাপারে প্রথম পরীক্ষাটি অবশ্য সাফল্যের মুখ দেখে নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বেশ কিছু ডায়নামো তৈরি হয়েছে। মাইকেল ফ্যারাডের নামানুসারে যার নাম রেখেছিলেন ফ্যারাডে মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যেই তিনি সর্বসাধারণের সামনে তাঁর ভাস্বর-দীপের প্রদর্শনী করতে চেয়েছিলেন। আর এই প্রদর্শনী উপলক্ষে খবর ছাপিয়ে চাকরি খোয়াতে বসেছিলেন তাঁর সাংবাদিক বন্ধু—যে কথা এই নিবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে।

1879 সালের 31 ডিসেম্বরের রাতে একটি স্পেশ্যাল ট্রেন আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে নিউইয়র্ক মেনলো পার্কে আসে। রেল কোম্পানীকে শুধু ঐ দিনটাই নয় বেশ কয়েক-দিন ধরে ঐ ট্রেন চালাতে হয়েছিল অসংখ্য যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্যে যারা এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে চেয়েছিল নিজের চোখে। বিস্ময় উদ্রেককারী বস্তুটি হচ্ছে এডিসনের ভাস্বরদীপ। তার থেকে 60টি বাতি ঝুলছে আর সেই বাতির আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পার্কের কয়েকটি বাড়িতেও সেই বাতি জ্বলছিল। নববর্ষের প্রাক্কালে ঘটে গেল এই ঐতিহাসিক ঘটনা।

এডিসন এরপর স্থির করলেন যে তিনি নিউইয়র্কের মত জনবহুল শহরে তাঁর বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার প্রদর্শনী করবেন — কিন্তু তার আগে চাই উন্নততর ফিলামেণ্ট। বাঁশ কি এ-কাজে লাগতে পারে? চিন্তা মাত্রই কাজে লেগেছেন। আর দিকে দিকে লোকেরা ছুটেছে তাঁর মনের মত জিনিসটি সংগ্রহ করতে। সত্যি বলতে কি সারা পৃথিবী তারা তোলপাড় করেছিল। জাপান থেকে আনা এক ধরনের বাঁশ দিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন এডিসন। কিন্তু তাও বাতিল করে দিয়েছিলেন ঠিক যেমনটি তিনি চান তেমনটি না পাওয়ার জন্যে। এ-ব্যাপারে তিনি ব্যয় করেছেন কয়েক লক্ষ টাকা আর সুদীর্ঘ দশ-দশটি বছর।

যাঁরা ভাবেন বৈজ্ঞানিকের মাথায় কোন আইডিয়া এসে বাসা বাঁধল আর তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে গেল অভিনব কোন বস্তু তাঁরা এডিসনের ভাস্বরদীপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটা অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবেন যে ব্যাপারটা মোটেই কিন্তু তা নয়। এর মূলে যেমন কাজ করে বৈজ্ঞানিকের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা তেমনই থাকে সেই মানুষটির নিরলস সাধনা অতি-মানবিক ধৈর্য আর অসাধারণ আত্মোৎসর্গ। জগতের অন্ধকার যিনি দূর করেছিলেন তাঁর জীবনী পাঠে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি।

21/12 নিউটন এভিন্যু, দুর্গাপুর-713205।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগীজনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।
- রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।
- এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ারদিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহকচাঁদা 40 00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 3 00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under certificateof posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রি ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 50 00 টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।**

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

অমরনাথ রায়

আইনস্টাইন

বিজ্ঞান নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকলেও অবসর সময়ে বেহালা বাজাতে ভালবাসতেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। উঁচু দরের অনেক পেশাদার যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে বসে তিনি অনেকবার বেহালা বাজিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

একবার ARTHUR SCHNABEL নামক এক বিখ্যাত পিয়ানো বাদকের সঙ্গে আইনস্টাইনের যুগ্মভাবে বেহালা বাজাবার একটা অনুষ্ঠান ছিল। যুগলবন্দী বাজনা শুরু হলো। যন্ত্রসঙ্গীতের আসর বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় গোল বাধালেন বেহালাবাদক আইনস্টাইন। বিজ্ঞানের এক জটিল তত্ত্ব হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো। তিনি অমনযোগী হলেন। তার ফলে বাজনার এক জায়গায় বিশ্রীভাবে তাল কেটে ফেললেন। SCHNABEL বিরক্ত হয়ে তখনই বলে উঠলেন 'কি ব্যাপার হে আইনস্টাইন? তুমি তো মস্ত বড় বড় আর জটিল আঁক কষতে পার, কিন্তু বাজনার তালটাও ঠিকমতো গুণতে পার না!'

হেনরি ক্যাভেণ্ডিস

সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইংরেজ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেণ্ডিস ছিলেন সবার চেয়ে ধনী এবং ধনীদের মধ্যে জ্ঞানী। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মেজাজের জন্যেও তিনি ছিলেন বিখ্যাত।

কথিত আছে যে, যখন এই বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে কোন বই পড়ার জন্য বের করতেন তখন 'বুক কার্ডে' তিনি নিজে সই করতেন, যেমনটি করে থাকেন বাইরের বই পড়ুয়ারা লাইব্রেরী থেকে বই নেবার সময়।

বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর নানান্ আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বায়ু একটি মিশ্রপদার্থ তা প্রমাণ করা এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের গঠনমূলক সংযুক্তি নির্ণয় করা।

নিকোলা টেসলা

'নিকোলা টেসলা' এক বিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানী ছিলেন। একদা এক ধনীগৃহে রাত্রিকালীন আহারে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিকোলা টেসলা।

যথাসময়ে ডাইনিং টেবিলের চারপাশের চেয়ারগুলিতে আমন্ত্রিত অতিথিরা বসে পড়লেন। কিন্তু বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অতিথি 'নিকোলা টেসলা' কৈ? গৃহকর্তা তখনই টেসলার ল্যাবরেটরীতে ফোন করলেন কিন্তু তাঁকে ফোনে পাওয়া গেল না। তাঁর সহকারী জানালেন, 'আপনি কি বিজ্ঞানী টেসলাকে ব্রাইয়াণ্ট পার্কে খোঁজ করেছেন?'

গৃহকর্তা শুধালেন, ব্রাইয়াণ্ট পার্কে? তার মানে, নিউইয়র্ক লাইব্রেরীর পিছনের সেই ছোট্ট পার্ক?—টেসলার সহকারী বললেন, হ্যাঁ।

গৃহকর্তা তখনই গাড়ি হাঁকিয়ে সেই পার্ক অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে বিজ্ঞানী টেসলা সেখানে বসে পায়রাদের খেতে দিচ্ছেন।

গৃহকর্তার প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানী টেসলা জানালেন, "এই পায়রাগুলিকে কেউ খেতে দেয় না তাই রোজ এই সময় এরা আমার আসার অপেক্ষায় থাকে। আর আমি ওদের নিরাশ করতে চাই না বলেই আগে এখানে চলে এসেছি। এবার চলুন, আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই।"

এডিসন

এক সময়ে এডিসন বৈদ্যুতিক বাতির বাল্ব আবিষ্কার নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। একটি অসমান কাচের বাল্বের ভেতরকার মাপের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি তাঁর সেরা সহকারীকে ডেকে ঐ কাজটির ভার দেন।

সহকারী যুবকটি ছিলেন গণিতশাস্ত্রবিদ। তিনি কাগজ কলম নিয়ে আঁক কষে সমস্যার সমাধানে লেগে গেলেন। বেশ কয়েকটি কাগজ তিনি আঁক কষে নষ্ট করলেন।

দিন চার পাঁচ পরে এডিসন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি হে, তোমার কাজ কতদূর এগুলো? সহকারী জবাব দিলেন।

—'বড়জোর আর এক হপ্তা', উত্তর দিলেন সহকারী। এ কথা শুনে এডিসন বললেন, 'এ কাজটা এক মিনিটেই করে ফেলা যায়। কিন্তু কেমন করে, তা দেখবে?'—এই বলে তিনি কাচের বাল্বটিকে সম্পূর্ণ জলপূর্ণ করলেন। তারপর বাল্বের মধ্যেকার সবটুকু জল ঢেলে ফেললেন একটি মাপক চোঙে। মাপক চোঙে জলের আয়তন মেপে তখনই বলে দিলেন ঐ বাল্বটির ভেতরকার আয়তন কতো।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এর যশ খুব বেড়ে যায়। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা তাঁকে ঘিরে ধরতেন, যখনই যেখানে তিনি যেতেন। স্কটল্যাণ্ডের এই বিনয়ী ও মৃদুভাষী বিজ্ঞানী তাতে খুবই বিরক্ত বোধ করতেন এবং যতটা সম্ভব কম কথা বলতেন।

একদা বাড়ির বাইরে বেরুতেই খবরের কাগজের জনৈক রিপোর্টার তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। ফ্লেমিং তাঁকে শুধালেন 'কি চান্ আপনি?'

রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, আপনি কি মনে করেন যে পেনিসিলিন আবিষ্কার করার পর আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে?'

প্রশ্ন শুনে ফ্লেমিং কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নেন। তারপর বলেন, 'প্রায় তাই। প্রতিদিন রিপোর্টারদের এরকম অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়া জীবন ধ্বংসেরই প্রায় সামিল।'

জুলে ভার্ন-এর

দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার

রূপায়ণ- গৌতম কর্মকার

হ্যারি, ঐ দেখ-একটা গহ্বর
হ্যাঁ--ঠিক--ওর ভিতর থেকেই শব্দটা আসছে। কান পেতে শোন।
আমি কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছি না হ্যারি। মনে হচ্ছে-এ তোর কল্পনা।
না না--ঐ--ঐতো--ভালো করে শোন-ডানা ঝাপটানোর শব্দ। আশ্চর্য! পাখী এলো কোত্থেকে? এই পাতালপুরীর গহ্বরে?
ফিরে চল হ্যারি, আমি বলছি-এ তোর মনের ভ্রম।
অসম্ভব। আমি বেশ বুঝতে পারছি-সব রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এই গহ্বরেই।
দড়ি নামা, আমি এখনি এই সুড়ঙ্গের মধ্যে নামবো।
একা?
হ্যাঁ, একাই।
হ্যারি তার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে নেমে পড়লো তখুনি।
এখনো সময় আছে হ্যারি, ফিরে আয়। আরো লোকজন ডেকে আনি।
পিছু ডাকিস না জ্যাক। অ্যাবার ফয়েলের এই রহস্য সমাধানের গৌরবটুকু আমাকে পেতে দে ভাই।

আশ্চর্য! কুয়োর মতো খাড়া একটা সুড়ঙ্গ। ক্রমেই যেন সরু হয়ে আসছে।
সুড়ঙ্গটার তলা থেকে টাটকা বাতাস উপরে উঠে আসছে।
মনে হচ্ছে-নিচে এসে পড়েছি। আরে, ডান দিকে ও কীসের আলো?
আর একটা সুড়ঙ্গ মনে হচ্ছে। কান্নার শব্দটা ওখান থেকেই আসছে।
আশ্চর্য! এ সুড়ঙ্গটা খাড়া নয়-অনুভূমিক।
আরও খানিক পর--
...আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ...
একি! এ যে একটা শিশু! কাঁদছে। কোত্থেকে এলো?
বাচ্চাটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে দড়িতে নাড়া দিল হ্যারি-উপরে তোলার সংকেত।
আবার সেই শব্দ-- ডানার ঝটপটানি--- ক্রমশ বাড়ছে-- কী করি?
ঐ-এসে গেল। উঃ, কী বিরাট পাখীটা! আক্রমণ করবে মনে হচ্ছে।
27

হ্যাঁ-- আসছে-- কী করি ? এক হাত জোড়া--দড়ি ঘুরছে-- মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে। সম্বল শুধু ছোরাটা---
ক্যাঁঅঅর্‌র্‌...
যাঃ -- ভাগ--ভাগ-- হতচ্ছাড়া পেঁচা--
জ্যাক, তাড়াতাড়ি-- জোরে--আরও জোরে টানো।
উঃ--কী বিরাট হারফাঙ! যাক, ভেগেছে--
ঘন্টা দুই পর--
মেয়েটা এ গহ্বরের মধ্যে গেল কী করে? পনেরো-ষোল বয়েস, কিন্তু ভীষণ রুগ্ন।
এ নিশ্চয় কোনও পরী। ওখানে কি কোনও মানুষ থাকতে পারে?
ম্যাগির শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে চোখ মেললো মেয়েটি।
তোমার নাম কী মা?
নে-ল!
তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?
হ্যাঁ, বড্ডো খিদে পেয়েছে। কদিন কিছু খাইনি।

অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্ সুকন্যা ভট্টাচার্য

অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্ কথাটা আজকাল সকলেরই প্রায় মুখে শোনা যায় কিন্তু আসলে জিনিসটা কি ?

অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্ হল এক ধরনের জৈব বস্তু যা ফাংগাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণিদেহ থেকে পাওয়া যায়। এই বস্তু অন্যান্য ক্ষতিকারক জীবাণু নষ্ট করে মানুষ এবং গাছপালাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। অনেকে একে বলেন 'জাদুর বড়ি'।

বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই এই ধরনের 'জাদুর বড়ি' প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কার হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নানা রকম কঠিন রোগ এর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে সেরে যেতে লাগল। 1940 সালে এইচ. ডবলিউ ফ্লোরির পেনিসিলিন তৈরির পরই সুরু হয় অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্ এর যুগ। ওয়াক্স্ম্যান 1947 সালে প্রথম অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্ নামটি প্রবর্তন করেন। অবশ্য এর বেশ কিছুদিন আগে সেণ্ট মেরীজ হাসপাতালে 1928 সালে অ্যালেক্সাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন।

অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্-এর কদর ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে অ্যাণ্টিবায়োটিক্ থেরাপির মাধ্যমে অসংখ্য সংক্রামক রোগ, যেমন ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, টিউবার কিউলোসিস এবং মেনিনজাইটিস আশ্চর্যভাবে সেরে যেতে পারে। ফলে ঐ সব রোগে মৃতের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যেতে সুরু করল।

পেনিসিলিন ছিল প্রথম অ্যাণ্টিবায়োটিক যা গ্রাম-পসিটিভ এবং কিছু গ্রাম নেগেটিভ এই দুই শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত। আমেরিকার রুট্‌জারস্ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক ওয়াক্সম্যান প্রথম টি. বি-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপযুক্ত অ্যাণ্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন নাম 'স্টেপ্টোমাইসিন'। পেনিসিলিন এবং স্টেপ্টোমাইসিন এই দুই অ্যাণ্টিবায়োটিক হল 'ন্যারো স্পেক্ট্রাম অ্যাণ্টিবায়োটিক'। অর্থাৎ এই দুটি জিনিস বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। ক্লোরামফেনিকল টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি হল 'ব্রড স্পেক্ট্রাম' অ্যাণ্টিবায়োটিক। এই জাতের অ্যাণ্টিবায়োটিক বহু ধরনের জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া, বেডসোনিয়া, ভাইরাস এবং রিকেটসিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।

অ্যাণ্টিবায়োটিকস্ নানাভাবে কাজ করে। অ্যাণ্টিবায়োটিক্স্ যেমন ভ্যানোমাইসিন্, সিফালোস্পোরিন পেনিসিলিন ইত্যাদি ব্যাক্টেরিয়ার কোষ-প্রাচীর তৈরি বন্ধ করে কাজ করে। এরিথ্রোমাইসিন, নিওমাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন ব্যাক্টেরিয়ার 'প্রোটিন সিন্থেসিস' বন্ধ করে কাজ করে। কলিস্টিন, নিস্টাটিন ইস্ট এবং অন্য কিছু ফাংগাসের কোষ মেম্‌ব্রেনের উপর কাজ করে। গ্রাইসোফুলভিন হল 'অ্যাণ্টি-ফাংগাল অ্যাণ্টিবায়োটিক।' গ্রাইসোফুলভিন কোষের ডি. এন. এ বা আর এন, এ সিন্থেসিস বন্ধ করে কোষের ক্ষতি করে।

আজকের যুগে আমরা ওষুধ বলতে অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের কথাই বেশি বলি। ওষুধ হিসাবে যদিও এটিকে খুব ব্যবহার করা হয় কিন্তু তা ছাড়াও অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের অন্যান্য অনেক গুণ আছে। গাছপালা রক্ষা, খাবার দাবার রক্ষার ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিসীম। কচি জন্তু জানোয়ারকে সুস্থ ও সবল করে তোলার জন্য অ্যাণ্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়।

দুঃখের বিষয় অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অ্যাণ্টিবায়োটিক্স শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। মুড়ি-মুড়কির মত অ্যাণ্টিবায়োটিক খেলে সে অ্যাণ্টিবায়োটিক আর কাজ করতে চায় না। তখন অন্য অ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রয়োজন।

অতিরিক্ত অ্যাণ্টিবায়োটিক মলম বা পাউডার হিসাবে ব্যবহার করলে নানা চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। ক্যাণ্ডিডিয়াসিস্ এমন এক রোগ। বেশি পরিমাণ পেনিসিলিন ব্যবহার করলে ইস্কেমিক গ্যাঙ্গরিন্ হতে পারে। নিও মাইসিন, ক্যানামাইসিন বেশি ব্যবহারের ফলে নার্ভের রোগ হয়। কখন কখন নেফ্রোটক্সিসিটি লক্ষ্য করা যায়। এরিথ্রোমাইসিন খেলে লিভারের অসুখ করতে পারে। টেট্রাসাইক্লিন দাঁতের সাদা রঙ নষ্ট করে দেয় ক্লোরাম-ফেনিকল রক্তের অসুখ করায়। আজকাল এর ব্যবহার তাই অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আজকাল। এ ছাড়া ক্লোরামফেনিকল কান এবং চোখের ক্ষতি করতে পারে।

আমাদের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে অ্যাণ্টিবায়োটিক দুভাবেই কাজ করে। খুব অল্প সময়েই রোগ সারিয়ে ফেলে কিন্তু সারানোর সময় দেহে অনেক মারাত্মক ক্ষতিও করে দেয়। এই কারণে দেশে বিদেশে এক সমস্যা দেখা দিয়েছে —একেই বলে অ্যাণ্টিবায়োটিক সমস্যা। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য' দপ্তর সর্বদাই সতর্কতার বাণী দিয়ে যাচ্ছে। নিজে বাঁচতে চাও? না, অ্যাণ্টিবায়োটিক বাঁচাতে চাও ?

16, টাউনসেণ্ড রোড, কল-25

ধারাবাহিক উপন্যাস

পনের ঃ অজানা উদ্দেশ্যে

কর্নেলিয়াস বললে—"ইউলিসি তোমাকে বাঁচাতে চাই বলেই ছুটে এলাম।"

"আমাকে?" অবাক হয়েছিলাম। কথাবার্তা হচ্ছে ল্যাবরেটরি থেকে ফেরবার পর—দিন কয়েক পরে।

"হ্যাঁ, তোমাকে। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।"

"কোন খবরটা?"

"নোভার কথা বলার খবর। হয়ত ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ফাঁস করে দিয়েছে। অথবা আর কেউ। ফলে তোমার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।"

"কি রকম?" ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। আবার কি বিপদ ঘনীভূত হচ্ছে নরবানরদের এই গ্রহে?

কর্নেলিয়াস জিরার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে—প্রথম চাঞ্চল্যটা সৃষ্টি করেছিলে তুমি। জেয়াস তোমার পয়লা নম্বর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্মেলনের পর থেকেই। তারপরেই ভাঙা শহরে আবিষ্কার করলাম মানুষের সভ্যতা আর তাদের রাশি রাশি কঙ্কাল। এত বড় খবর চেপে রাখা যায় না। আমি চুপচাপ থাকলেও কাগজে কাগজে এখন এই খবরই ছাপা হচ্ছে। তারপরেই নোভার মগজের কোষ থেকে উদ্ধার করা অতীতের কাহিনী। ইউলিসি, সব কটা খবর জোরদার করেছে জেয়াসের হাত। তলে তলে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল অনেকদিন ধরেই। এখন এই গ্রহের হর্তাকর্তাদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, তুমি বেঁচে থাকলে বিপদ প্রত্যেকেরই! মানুষ জাতের পতন ঘটিয়েই নরবানররা কব্জায় এনেছে সোরোরের সভ্যতা। তুমি মানুষ জাতের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে পারো। তোমার থেকে নতুন করে বুদ্ধিমান মানুষ জাত আবার জন্মাতে পারে। নরবানরেরা আবার কোনঠাসা হবেই। সুতরাং—

"আমাকে খতম করে দেওয়া হোক, এই তো?" সক্ষোভে বললাম আমি। জেয়াসের ভয় যে অমূলক নয়, তা তো আমি জানি। খাঁচার মানুষগুলো এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে লীডার বলে মেনে নিয়েছে। মানবিক ধীশক্তির স্ফুরণও দেখতে পাচ্ছি চোখের ঝিলিকে। আমাকে দেখলে এখন আর গর্জায় না—আমারই শেখানো ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলি কপচায়। মনে বড় আশা, এইভাবেই মানুষ জাতটাকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে পারব। পাজির পা ঝাড়া জেয়াস ঠিক টের পেয়েছে।

কর্নেলিয়াস বললে—"ইউলিসি, খতম করার চাইতেও জঘন্য প্ল্যান আঁটা হচ্ছে। এক্সপেরিমেন্টের অছিলায় তোমার মগজ জখম করে দেওয়া হবে। ঘিলু খুবলে বার করে নেওয়া হবে।"

শিউরে উঠলাম আমি—"তোমরা দুজনে—"

হাসল কর্নেলিয়াস। বললে—"তোমাকে বাঁচাতে চাই

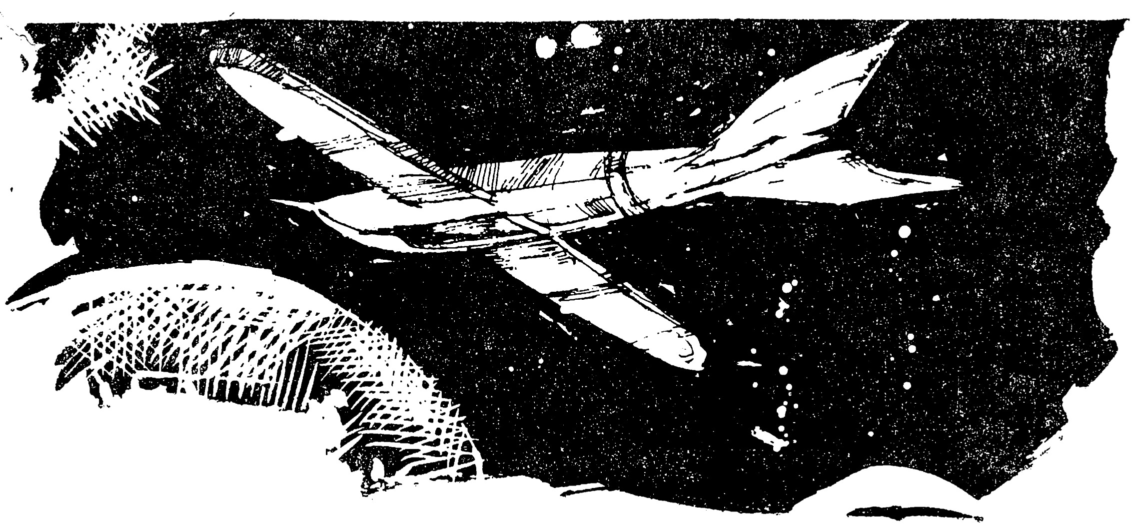

কোথায় শেষ হবে এই যাত্রা—কে জানে ?

ইউলিসি।"

"বাঁচাবে ? কিভাবে ?"

"যে স্পেসশিপে চড়ে এসেছিলে, তাতে চেপেই পালাও। শোনো, সব কথা বলতে দাও। আমার এক বন্ধু অবজার্ভেটরীতে কাজ করে। সে দেখেছে, তোমাদের স্পেসশিপ এখনও পাক দিচ্ছে সোরোর গ্রহকে। অক্ষত অবস্থায়।

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ, সত্যি। দশ দিন পরেই একটা স্যাটেলাইট তুলে দেওয়া হবে সোরোর গ্রহকে ঘিরে চর্কিপাক দেওয়ার জন্যে—ভেতরে থাকবে একজন মানুষ।"

"কেন ?"

"পৃথিবীতে তোমরা পশু পাঠাও স্যাটেলাইটে যে কারণে—সেই কারণে। কসমিক রে-র কি প্রতিক্রিয়া হয় জীবদেহে—তা দেখবার জন্যে।"

মুখটা নিশ্চয় কালো হয়ে গেছিল আমার। অভয় দেওয়ার ভঙ্গিমায় কর্নেলিয়াস বললে—"ইউলিসি, যে মানুষকে পাঠানোর কথা, তার বদলে থাকবে তুমি—সে ব্যবস্থাও করেছি আমি। তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে স্যাটেলাইট নড়াতে চড়াতে হয় কিভাবে—তোমাকেও আমি শিখিয়ে দেব এই দশ দিনে।

"কিন্তু প্রফেসর অ্যান্টেলে ?"

"তাঁকে নিয়ে যেও না। অনেক চেষ্টা তো তুমি করলে। আলাদা ঘরে এনে রাখলে। দিনের পর দিন দেখা করেছ। তোমার কোনো কথার উত্তর দিয়েছেন কী ?"

"না। শুধু হাতের কেক কেড়ে নিয়ে খেয়েছেন।" ক্ষোভে বলেছিলাম। প্রফেসর অ্যান্টেলে পশুর জীবনই বেছে নিয়েছেন—নিশ্চিন্ত জীবন - মানুষ হতে আর চান না।

"নোভার খবর জানতে চাও ?" এতক্ষণে কথা বলল জিরা।

"কি রকম আছে ?" সাগ্রহ প্রশ্ন আমার।

"মারা গেছে", সংক্ষিপ্ত জবাব জিরার।

মহাশূন্য চিরে ছুটে চলেছে আমার মহাকাশযান। মহাশূন্যে আমি একা একেবারে একা।

কর্নেলিয়াস আর জিরার প্ল্যান সফল হয়েছিল। এক্স-পেরিমেন্টের মানুষের বদলে আমিই উঠেছিলাম স্যাটেলাইটে। সরিয়ে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম স্পেসশিপের খুপরি ঘরে। দরজা খোলাই ছিল আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। ভেতরে ঢুকতেই চালু হয়ে গেছিল অটোমেটিক রোবট। হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল ইলেকট্রনিক কলকব্জা।

সোরোর গ্রহের আকাশ থেকে নক্ষত্রবেগে উধাও হয়ে গেছিল স্পেসশিপ। বহু নিচে নিশ্চয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল কর্নেলিয়াস, জিরা আর তাদের বন্ধুরা। রটিয়ে দিয়েছিল মিথ্যে খবরটা – দুর্ঘটনায় পড়ে খান্ খান্ হয়ে গেছে স্যাটেলাইট। জেয়াসের খপ্পর থেকে এছাড়া আর বাঁচবার আর উপায়ও ছিল না। আমি একা পারতাম না মানুষ জাতটার চৈতন্যোদয় ঘটাতে। বরং আবার ফিরে আসব পৃথিবী থেকে লোকজন নিয়ে। তারপর দেখা যাবে।

আমার এই পরিকল্পনা শুনে কিন্তু হেসেছিল কর্নেলিয়াস। বলেছিল—"আপেক্ষিকতাবাদ আমরাও জানি, ইউলিসি। তোমার চার পাঁচ বছর আমাদের এখানে হাজার বছরেরও বেশি। তদ্দিনে কি ঘটবে, তা কে জানে ?"

তা ঠিক। পৃথিবীতে গিয়েও ত দেখব কয়েক শতাব্দী পার করে এসেছি। মা-বাবা বন্ধু-বান্ধব কেউ আর নেই।

কিন্তু মানুষ তো থাকবে। তাদের নিয়েই ফিরে আসব সোরোর গ্রহে।

দেখতে দেখতে বিশাল বেটেলগ্যজ সূর্য মিলিয়ে গেছিল অগন্তি নক্ষত্রের মধ্যে।

অনেক মাস পরে দেখতে পেলাম পরিচিত সূর্যকে। একটার পর একটা গ্রহকে পাশ কাটিয়ে এলাম পৃথিবীর ওপর। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার পরেই দেখতে পেলাম ফ্রান্সকে।

চোখে জল এসে গেল আমার। সাতশ বছর পরে নামব প্যারিসের এয়ারপোর্টে।

দ্বিতীয় লঞ্চে উঠে বসলাম। অঙ্কের হিসেবে চালু হয়ে গেল রেট্রো-রকেট। এসে পড়লাম প্যারিসের ওপর। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ইফেল টাওয়ার। এখনো অটুট!

লঞ্চ নামল এয়ারপোর্টে। লোকজন কিন্তু ভিড় করে এল না। দৌড়ে এল না। এয়ারপোর্টের এক অংশ থেকে দেখলাম একটা প্লেনকে উড়ে যেতে। সেকেলে মডেলের প্লেন। অবাক হলাম। এত বছর পরে ফিরছি, অনেক আধুনিক মডেল আশা করেছিলাম।

লঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়াতেই মোটর গর্জন শুনলাম দূরে। একটা মোটর ছুটে আসছে এদিকে। একেবারেই মান্ধাতার আমলের ঝরঝরে মডেল। ব্যাপার কী?

প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এসে দাঁড়াল মোটর। লম্বা লম্বা ঘাস ঠেলে আর আসতে পারেনি। দূর থেকে দেখলাম মাত্র দুজন রয়েছে গাড়িতে। চালক নেমে দাঁড়াল। আমার দিকে পেছন ফিরে দরজা খুলে ধরল। পেছনের সিটে বসা আরোহী নেমে দাঁড়াতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল আমার।

একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে সভ্য বেশ পরা একজন গরিলা!

অজানার উজানে

জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে। কোনোরকমে পালিয়ে এলাম বটে, কোথায় শেষ হবে এই যাত্রা, জানা নেই। একদিন জ্বালানি ফুরোবেই, জমানো খাবারদাবারও ফুরোবে—তার পরে মহাশূন্যে ভেসে যাক নিষ্প্রাণ এই স্পেসশিপ—আমার কবরখানা হয়ে।

ফিলিস বললে—শেষ?
পাণ্ডুলিপি রেখে দিয়ে জিন বললে—হ্যাঁ, এইখানেই শেষ।
"মানুষ কথা বলতে পারে, বিশ্বাস হয়?"
শিম্পাঞ্জী-হাসি হেসে জিন বললে—"পাগল। কেউ উপন্যাস ফেঁদেছে।"
সুতরাং অলীক উপন্যাসই হয়ে থাকুক ভবিষ্যতের এই ভয়ানক কাহিনী!

[**সমাপ্ত**]

ব্লক-এ, ফ্লাট-9, সি. আই টি বিল্ডিং, কলকাতা-10

আগামী সংখ্যা থেকে

নীল সাগরের বুকে সবুজ দ্বীপ, আন্দামান। চারদিকে ছড়িয়ে আছে আরও জানা-অজানা কত ছোট বড় দ্বীপ। দ্বীপের বনজঙ্গলে রয়েছে কত বিচিত্র গাছপালা পশুপাখি। শুধু তাই-ই নয়, বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রচুর তেল পাওয়া যেতে পারে আন্দামানে। তারই গোপন সন্ধানে চলেছেন সৃজন কাকা, সঙ্গে বাদল। কিন্তু তেলের চোরা চালানকারীরা কি আগে থেকেই তৎপর হয়ে কাজ চালাতে শুরু করেছে? অনুসন্ধান চালাতে চালাতে হঠাৎ সৃজন কাকা-রা এসে পড়েন সেই দ্বীপে। তারপর? দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস 'নীল সাগরে রহস্য'। আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে।

চাই

'লাইফ সায়েন্স কুইজ'-এর উত্তর ঃ।

1. ছত্রাক। 2. সূর্যের উত্তপ্ত কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুর রূপান্তরের সময় যে শক্তি বিচ্ছুরিত হয় তাকে ফোটন কণা বলে। 3. বায়ুতে Co_2 গ্যাসের স্বাভাবিক পরিমাণ 0·03%। প্রায় 1·0% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি পায় কিন্তু অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদ দেহে বিক্রিয়া ঘটে। 4. মাটিতে লৌহ বা নাইট্রোজেন বা ম্যাগনেসিয়াম লবণের অভাব ঘটলে গাছে ক্লোরোফিল তৈরি হয় না এবং গাছের রং হলুদ হয়ে যায়। গাছের এই অবস্থাকে ক্লোরোসিস বলে। 5. সালোকসংশ্লেষে জল অণুর বিশ্লেষণে H^+ ও OH^- আয়ন নির্গমন প্রথম লক্ষ্য করেন বৈজ্ঞানিক রোবিন হিল। তাই এই বিক্রিয়াকে হিল বিক্রিয়া বলা হয়। 6. এই জল পুনরায় গাছের বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। 7. ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA) 8. সঞ্চয়ী শ্বেতসার রূপে সঞ্চয়ী অঙ্গে জমা হয়। 9. দিনের বেলায় সালোক সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন গ্লুকোজ উৎসেচকের প্রভাবে শ্বেতসারে রূপান্তরিত হয়, সূর্যাস্তের পর এই শ্বেতসার পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়। এইভাবে উৎপন্ন শ্বেতসারকে বলে আত্তীকরণ শ্বেতসার। 10. এক ধরনের এককোষী সবুজ শেওলা। 11. ইংরাজ রাসয়নবিদ যোসেফ প্রিস্টলী। 12. মৃত্যু ঘটে। 13. শ্বসনকালে গ্যাসের পরিবহণ রক্তের যে পদার্থের মাধ্যমে ঘটে তাকে শ্বাসরঞ্জক বলে। 14. পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল, শ্বাসমূল ইত্যাদি। 15. ক্যারোটিন নামক রঞ্জক পদার্থটির জন্য, সবুজ ঘাস-পাতা থেকে এই রংটি ডিমের কুসুমে সঞ্চিত হয়। ক্যারোটিন থেকে ভিটামিন 'A' তৈরি হয়। 16 16·4%। 17. আলোকের যে প্রখরতায় সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন হার সমান হয় তাকে ক্ষয়পূরণ বিন্দু বলে। এই সময় গাছের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। 10. ক্লোরোফিল সূর্যালোকের ফোটন কণা শোষণ করে সক্রিয় হয় এবং জলকে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রক্সিল আয়নে বিশ্লিষ্ট করে। একেই ফেটোসিস্ বলে। 19. নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাই নিউক্লিওটাইড ফসফেট। 20. জলীয় বাষ্প। 21. শ্বেতসার, সেলুলোজ। 22. 4 কিলো ক্যালরি। 2'. ক্রোমোপ্রোটিন। 24. 9·3 কিলো ক্যালরি। 25. না। 26. ক্যাশিমির ফাঙ্ক। 27. ভিটামিন A, D, K, B_{12}। 28. দেহে প্রয়োজনের তুলনায় কম ভিটামিন থাকলে তাকে হাইপোভিটামিনোসিস বলে। 29. যে সব ভিটামিন সদৃশ রাসায়নিক পদার্থ ভিটামিনের কাজে বাধা প্রদান করে, তাকে নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট করে সেই সব পদার্থকে অ্যান্টিভিটামিন বলে। 30. রেটিনল। 1. 1—1·5 গ্রাম। 32. শকুন, কাক। 33. উকুন, ছারপোকা। 34. ক্ষণপদের সাহায্যে। 35. ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীর ভাঁজ হয়ে অসংখ্য আঙ্গুলের মত অংশে পরিণত হয়, এদের ভিলাই বলে। 36. 80—120 মিলিগ্রাম। 37. কোন প্রাণী যখন নিশ্চল হয়ে বিশ্রাম করে সেই সময় তার জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম শক্তিব্যয়ে যে বিপাক ক্রিয়া চলে তাকে মৌল বিপাক বলে। 38. 1400 কিলো ক্যালরি। 39. কপার (Cu) এবং জিঙ্ক (Zn)। 40 এরা স্বভোজী, পতঙ্গ ছাড়াই এরা বেঁচে থাকতে পারে। 41. হাইড্রার দেহে। 42. মলের সঙ্গে পিত্তরঞ্জক মিশ্রিত হওয়ার জন্য হলুদ বর্ণ হয়। 43 অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভাঙ্গনের ফলে যে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় তা যকৃতে এসে অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়ায় পরিণত হয়। 44. দুধ। 55. খাদ্য-নালীর অনৈচ্ছিক পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণকে ক্রমো-সঙ্কোচন বা পেরিস্টালসিস্ বলে। 46. পিত্তরস পাকস্থলীর রসের অম্লতা প্রশমিত করে এবং পিত্তলবণ ফ্যাটের পরিপাক ও শোষণে সাহায্য করে। 47. মানুষের অন্ত্রে ই. কোলাই (E coli) ব্যাকটেরিয়া এবং উইপোকার অন্ত্রে অবস্থিত ট্রাইকোনিম্ফ নামক এককোষী প্রাণী। 48. ভিটামিন K। 49. বয়স্কদের ভিটামিন D-র অভাবে অস্থিগুলি নরম হয় এবং দেহের ভারে অস্থিগুলি বেঁকে যায়। এই অবস্থাকে অস্টিওম্যালেসিয়া বলে। 50. মনোট্রোপা। 51, ফ্লোয়েম তন্তু ছাড়া সব উপাদান সজীব। 52. মাছের পটকা ও পার্চমেন্ট কাগজ। 53. অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়। 54 ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে। 55. একপ্রকার ছিদ্রযুক্ত প্লেট। তারা মাছের দেহে থাকে। 56. আরশোলা, চিংড়ি, শামুক প্রভৃতির দেহে মুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। এদের রক্ত বহনকারী দেহ-গহ্বরকে হিমোসিল বলে। 57. প্রায় 55 ভাগ রক্তরস ও 45 ভাগ রক্তকোষ থাকে। 58. হিমোসায়ানিন নামক এক-প্রকার তাম্রঘটিত পদার্থের জন্য। 59. অস্থিমধ্যস্থ লাল-মজ্জার মধ্যে তৈরি হয়। 60. অক্সিহিমোগ্লোবিন। 61 লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কমে গেলে রক্তের সেই অবস্থাকে ওলিগোসাইথিমিয়া বলে। 62. শ্বেতরক্তকণিকা। 63. রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে গেলে সেই অবস্থাকে লিউকোপেনিয়া বলে। 64. রক্তে যদি শ্বেতকণিকার সংখ্যা খুব বেড়ে যায় (প্রতি ঘন মিলিমিটারে 50 হাজার থেকে এক লক্ষ) তাহলে সেই অবস্থাকে লিউকোমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে। 65. 3 থেকে 4 মিনিট। 66. রক্ত জালক ভেদ করে রক্ত থেকে যে ঈষৎ হলুদ বর্ণের স্বচ্ছ ক্ষার-ধর্মী যোগকলা কোষান্তর স্থানে জমা হয় তাকে লসিকা বলে। 67. ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য রক্ত ঝাঁকুনি দিয়ে প্রবাহিত হয়। 68. কপাটিকা বা ভালভ। 69. স্টেথোস্কোপের সাহায্যে। 70. বেসোফিল শ্বেতকণিকা হেপারিন ক্ষরণ করে রক্ত নালীর মধ্যে প্রবহমান রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। 71. প্রোটিন ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে। 72. সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের। 73. যে সব শিরা জালক থেকে উৎপন্ন হয়। 74. শিরার স্পন্দন নাই। 75. ধমনীর শেষ-প্রান্তে ও শিরার উৎপত্তি স্থলে সূক্ষ্মতম রক্তনালীকে বলে।

ল.সা.গু ও গ.সা.গু প্রসঙ্গে

অসীম মুখোপাধ্যায়

নিবন্ধে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই পূর্ণ এবং ধনাত্মক। দুটি সংখ্যার মধ্যে কোনো সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক না থাকলে সেই সংখ্যা দুটিকে পরস্পর মৌলিক বলা হবে। নিবন্ধে উৎপাদক হিসাবে 1 সংখ্যাটি গ্রহ্য নয়।

মনে করি ক এবং খ দুটি সংখ্যা এবং গ এদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক সংক্ষেপে গ. সা. গু. ; তাহলে এমন দুটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা চ এবং ছ থাকবে যাদের জন্য

ক = গ × চ এবং খ = গ × ছ

হবে। এখন প্রচলিত নিয়মে ক এবং খ-এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক সংক্ষেপে ল. সা. গু. নির্ণয় করা হবে। ধরি ল. সা. গু-টি ল।

গ | ক, খ
　 চ, ছ

অতএব, ল = গ × চ × ছ [যেহেতু চ, ছ পরস্পর মৌলিক] উভয় পক্ষকে গ দ্বারা গুণ করে পাওয়া যাবে

ল × গ = গ × চ × ছ × গ

= (গ × চ) × (ছ × গ) = ক × খ.

উপরিপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি সূত্রাকারে লেখা যায়—

সূত্র 1, দুটি সংখ্যার ল. সা. গু এবং গ. সা. গু-র গুণফল সংখ্যা দুটির গুণফলের সমান।

এটি ল. সা. গু. এবং গ সা. গু. সংক্রান্ত অতিমূল্যবান সূত্র। সংশ্লিষ্ট বহু সমস্যা সমাধানে এই সূত্রটি অপরিহার্য।

উদাহরণ. দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4 এবং এদের ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু. যথাক্রমে 48 এবং 4 ; সংখ্যা দুটি নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি সংখ্যা দুটি ক এবং খ ; প্রশ্নানুসারে ক : খ = 3 : 4, বা, ক = $\frac{3}{4}$ খ। সূত্র 1-এর সাহায্যে

ক × খ = ল সা. গু. × গ সা. গু. = $48 \times 4 = 192$

বা, $\frac{3}{4}$ খ^2 = 192

বা, খ^2 = $192 \times 4 \div 3 = 256$

বা, খ = $\sqrt{256} = 16$ অতএব ক = $\frac{3}{4}$ খ = $\frac{3}{4}$ 16 = 12 ;

∴ নির্ণেয় সংখ্যাদ্বয় 12 এবং 16

ওপরের উদাহরণ থেকে একটি সূত্রের অবতারণা করা যেতে পারে।

সূত্র 2. দুটি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যার বর্গ = সংখ্যা দুটির অনুপাত, ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু. প্রভৃতির গুণফল।

তিনটি সংখ্যার ক্ষেত্রে সূত্র-1 প্রযোজ্য কিনা সেটি পরীক্ষা করা যাক। ধরা যাক 6, 9 এবং 12 তিনটি সংখ্যা, এদের গুণফল $6 \times 9 \times 12 = 648$, ল সা. গু. = 36, গ. সা. গু 3 এবং ল সা. গু. × গ. সা. গু = $36 \times 3 = 108$। স্পষ্টতঃ এই তিনটি সংখ্যার ক্ষেত্রে সূত্র-1 খাটছে না। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিনটি সংখ্যা যদি পরস্পর মৌলিক হয় তাহলে সূত্র-1 প্রযোজ্য হবে কারণ সেক্ষেত্রে তিনটি সংখ্যার ল. সা গু. = তিনটি সংখ্যার গুণফল এবং গ. সা গু. = 1। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক, খ এবং 1 এই তিনটি সংখ্যার ল সা. গু = ক এবং খ সংখ্যা দুইটির ল. সা. গু এবং এদের গ সা. গু. = 1। এই সব আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সূত্র-1 দু'য়ের অধিক সংখ্যক সংখ্যার ক্ষেত্রে সার্বিক নয়। তথাপি তিনটি সংখ্যার ক্ষেত্রে সূত্র-1-এর কোনো অনুরূপ সূত্র উপস্থাপন করা যায় কিনা তা অনুসন্ধান করা যাক।

মনে করি ক, খ এবং ঘ তিনটি সংখ্যার গ. সা. গু. = গ ; তাহলে চ, ছ এবং জ এমন তিনটি সংখ্যা থাকবে যাতে

ক = গ × চ, খ = গ × ছ, ঘ = গ × জ

হবে এবং চ, ছ এবং জ-এর মধ্যে কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকবে না।

মনে করি চ এবং ছ-এর গ. সা. গু = ত, তাহলে ট এবং ঠ এমন দুটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা থাকবে যে

চ = ত × ট এবং ছ = ত × ঠ

হবে। পুনরায় মনে করি ঠ এবং জ-এর গ. সা. গু = থ, তাহলে এমন দুটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা প এবং ফ থাকবে যেখানে

ঠ = থ × প এবং জ = থ × ফ

হবে। পরিশেষে, ট এবং ফ-এর গ. সা. গু = ন হলে, এমন দুটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা শ এবং স থাকবে যেখানে

ট = ন × শ এবং ফ = ন × স

হবে।

ওপরের সম্পর্কগুলি থেকে লেখা যায়—

ক = গ × ত × ন × শ

খ = গ × ত × থ × প

ঘ = গ × থ × ন × স

যেখানে শ, প এবং স সংখ্যা তিনটির মধ্যে কোনো

সাধারণ উৎপাদক নেই। এবং

ক এবং খ-এর গ. সা. গু. = গ × ত

খ এবং ঘ-এর গ. সা. গু. = গ × থ

ঘ এবং ক-এর গ. সা. গু = গ × ন

এখন প্রচলিত নিয়মে ক, খ এবং ঘ-এর ল. সা. গু. নির্ণয় করা যাক।

```
গ | ক          ,    খ          ,    ঘ
ত | ত×ন×শ ,  ত×থ×প ,  থ×ন×স
থ | ন×শ    ,     থ×প     ,     থ×ন×স
ন | ন×শ    ,       প       ,       ন×স
       শ         ,       প        ,       স
```

এখানে শ, প এবং স পরস্পর মৌলিক।

∴ ক, খ এবং ঘ-এর ল. সা. গু = গ × ত × থ × ন × শ × প × স.

এখন ক × খ × ঘ = (গ × ত × ন × শ) × (গ × ত × থ × প) × (গ × থ × ন × স)
= (গ × ত × থ × ন × শ × প × স) × (গ + ত) × (গ × থ) × (ন × গ) ÷ গ

[ক, খ, ঘ-এর ল সা গু] × [ক, খ-এর গ. সা. গু.] × [খ × ঘ-এর গ. সা গু.] × [ঘ, ক-এর গ. সা. গু]
‖ ——————————————————————
[ক, খ, ঘ-এর গ. সা. গু.]

তিনটি সংখ্যার ল সা. গু. এবং গ. সা. গু. সংক্রান্ত এটিই ইঙ্গিত সূত্র-3।

6, 9 এবং 12 সংখ্যা তিনটির ক্ষেত্রে সূত্র-3কে প্রতিপাদন করা যাক। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই তিনটি সংখ্যার গুণফল = 648, ল. সা. গু. = 36 এবং গ. সা. গু = 3। স্পষ্টতঃ এখন 6 এবং 9-এর গ. সা. গু. = 3, 9 এবং 12-এর গ সা. গু. = 3 এবং 12 এবং 6-এর গ. সা. গু. = 6

সূত্র 3-এর ডানপক্ষ = $\frac{36 \times 3 \times 3 \times 6}{3}$

= 648

= সংখ্যা তিনটির গুণফল।

আরও উদাহরণের মাধ্যমে সূত্র 3-এর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। সূত্র 3-এ ঘ = 1 ধরলে সূত্র-1 সহজেই পাওয়া যায়, কারণ সেক্ষেত্রে ক × খ × ঘ = ক × খ, ক, খ এবং ঘ-এর ল সা' গু. = ক, খ-এর ল সা. গু., খ, ঘ-এর গ সা. গু = 1 ঘ, ক-এর ল. সা. গু. = 1 এবং ক, খ, ঘ-এর গ. সা. গু = 1

28/4/ /1B শ্রীমোহন লেন, কলি—26

লিমুরিয়া-মনুষ্যজাতির উদ্ভবস্থল

সুশান্ত সাহা

লিমুরিয়া—একটি কাল্পনিক দেশ। কাল্পনিক বলা হচ্ছে এই জন্য যে বর্তমানে এ নামে কোন দেশ পৃথিবীতে নেই। বর্তমানকালের বিজ্ঞানীদের অনুমান গণ্ডোয়ানা দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও বহু লক্ষ বছর ধরে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ ছিল। এরই নাম লিমুরিয়া।

ডারউইন এবং টমাস হ্যাক্সলের লেখার উপর নির্ভর করে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, "কয়েক হাজার বছর আগে, ভূতাত্ত্বিকদের ভাষায় টারসিয়ারী যুগের শেষের দিকে উষ্ণ অঞ্চলের কোন এক জায়গায় সম্ভবতঃ বর্তমানে ভারত মহাসাগরে লুপ্ত এক মস্ত বড় মহাদেশে লেজহীন নরাকার বানরেরা বাস করত।"

জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেলের মতে লেজহীন নরাকার বানর থেকে মনুষ্যবর্গীয় জীবের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে রয়েছে একটি লুপ্ত ধাপ। হেকেল এই বর্গের জীবের নাম দিলেন পিথেক্যানথোপাস। তাঁর মতে এরা লিমুরিয়ায় বসবাস করত এবং এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায়। তাঁর এই তত্ত্বের সমর্থনে পিথেক্যানথোপাসের হাড় খুঁজে পাওয়া গেল জাভা দ্বীপ, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে।

বিজ্ঞানীদের কল্পনায় লিমুরিয়া ছিল ঘন বনে আবৃত একটি নিচু ভূভাগ যার দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে আগ্নেয় পর্বত। এই বনে বসবাসকারী ছোট জীবেরা পোকা-মাকড় খেত এবং ক্রমশঃ তারা আকারে বড় হয়ে উঠল ও প্রয়োজনের খাতিরে তাদের দৃষ্টিশক্তি হল আরও তীক্ষ্ণ। শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্য তাদের থাবা ক্রমশঃ শক্তসমর্থ হয়ে উঠল এবং এইভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ হাত গড়ে উঠল এবং আয়ত্ত করে নিল গাছে চড়া। এইভাবে আনুমানিক 7 থেকে 10 কোটি বছর আগে প্রথম উচ্চস্তরের স্তন্যপায়ীজীব লেমুরের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীতে।

এরপর প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে লিমুরিয়ার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ক্রমশঃ ডুবে যেতে থাকে। অর্ধবানরাকৃতি জানোয়ারেরা আকারে খুব বড় হয়ে উঠে এবং খাবারের খোঁজে নেমে আসে গাছ থেকে মাটিতে। কিন্তু বিবর্তনের এই ধারায় সৃষ্ট দ্বিপদ লেমুরেরা মানুষে পরিণত হয় না। অর্ধবানরাকৃতি জীবেরা নয়, পূর্ণ বানরেরা বিবর্তনের ধাপে ধাপে লেজহীন নরাকার বানরে পরিণত হয়। এরাই মানুষের সবচেয়ে আদি পুরুষ।

সুশান্ত সাহা, 40/1 ট্যাংরা রোড,

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা

দিন-কানা / দিলীপ মালাকার

আমাদের দেশ সত্যি বিচিত্র। বৈচিত্র্যে ভরা এই ভারতের জলবায়ু থেকে আরম্ভ করে মানুষের চেহারায় কত বৈচিত্র্য! কত রকমের মানুষ বাস করেন এই দেশে। কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ পীত বর্ণের। মানুষের আকারে-গঠনে, ভাষায় সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের ধারা বয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। বহু জাতির সংমিশ্রণে যেমন আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি বহু রোগেরও আমদানি হয়েছে। ভালোর সঙ্গে কিছু খারাপও আমরা পেয়েছি। সারা বিশ্বে যত রকমের অসুখ-বিসুখ আছে তার সব কটি রয়েছে আমাদের দেশে। আবার এমন কিছু রোগ আমাদের দেশে এখনো রয়েছে যা ইউরোপ আমেরিকায় নেই। যেমন বসন্ত রোগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি। এ সব রোগ কিন্তু এককালে ইউরোপ আমেরিকায় ছিল। তিন চারশ বছর আগে ইউরোপে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত রোগে গ্রাম বা শহরের পাড়াকে-পাড়া সাফ হয়ে যেত। মড়ক লাগত তখন ওদের দেশেও। একশ বছর হল এই সব রোগ ওরা হটিয়ে দিয়েছে ইউরোপ আমেরিকা থেকে। এই শতাব্দীর গোড়ায় ইউরোপের কোনো কোনো দেশে কলেরা, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। এখন সে সবও দূর হয়েছে।

চোখের রোগ সবচেয়ে বেশি ভারতে, এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশে। সারা বিশ্বের মধ্যে অন্ধের সংখ্যা খুবই বেশি ভারতে, ভারত উপমহাদেশে, এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশে। চক্ষু রোগের আকৃতি প্রকৃতি কত রকমের। রাতকানা-দিনকানাও চক্ষু রোগের মধ্যে পড়ে। এ এক বিচিত্র রোগ।

রাত কানাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক সরস কাহিনী জানি। রাতকানাদের নিয়ে কত গল্প নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু দিনকানাদের খবর আমরা কজন রাখি। রাতকানারা দিনে ভাল দেখে, রাতে তাঁরা মোটেই দেখতে পান না। বা কম দেখেন। রাতের অন্ধকারে ভাল চোখের মানুষও কম দেখেন। তাকে আলোর সাহায্য নিতে হয়। অন্ধকারে দেখা যায় না বলেই তো আলোর উৎপত্তি। কিন্তু দিনকানারা স্বতন্ত্র। দিনকানারা সূর্যের প্রখর আলোয় ভাল দেখতে পান না। দিনের বেলায় একটু ছায়ায় বা আধো আলোয় এরা ভাল দেখতে পান। তাই ডাক্তাররা তাদের দিনকানা না বলে সূর্যকানা বলেন। সূর্যকানাদের চোখের রোগ এমনই যে সূর্যের প্রখর আলো এরা সহ্য করতে পারে না। একটু স্তিমিত আলো এরা সহ্য করতে পারে।

বিশ্বের বহু দেশেই রাতকানাদের সংখ্যা অল্প-বিস্তর রয়েছে। কিন্তু দিনকানা বা সূর্যকানাদের সংখ্যা সারা বিশ্বে কয়েকশর বেশি নয়। এ এক বিচিত্র রোগ। আর এদের বেশির ভাগের বাস এই ভারতবর্ষে। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরেই এদের বাস। বাকি কিছু সূর্যকানাদের পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতে। এদের অসুখ অন্য রকমের। সূর্যের সবকটি রং এরা দেখতে পায় না। দিনকানা বা সূর্যকানাদের চক্ষু রোগ আসলে বংশগত। ইংরেজিতে এদের বলে অ্যাক্রোম্যাট। ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং আইসল্যাণ্ডে কিছু অ্যাক্রোম্যাটদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বঙ্গদেশে দিনকানার সন্ধান পাওয়া গেছে বহুকাল আগেই। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় একশ বছর আগেই দিনকানাদের উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনায়।

বছর কয়েক আগে বিষ্ণুপুরের সূর্যকানাদের নিয়ে গবেষণায় এগিয়ে এসছিলেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক স্যার ডবলু পিক ফোর্ড ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা রুথ পিকফোর্ড। অধ্যাপক পিক ফোর্ড কালার ভিসান বা রং চেনার বিশেষজ্ঞ। তিনি বিষ্ণুপুরের সূর্যকানাদের অ্যানোমালিস্কোপ যন্ত্র সাহায্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। অধ্যাপক পিকফোর্ড আমায় বলেছিলেন, সাধারণতঃ বিশ্বের অন্য সব দেশে প্রতি ষাট হাজার জনসংখ্যার একজন করে অ্যাক্রোম্যাট অর্থাৎ সূর্যকানার সন্ধান পাওয়া যায়। এদের দিনকানাও বলা হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের লোকসংখ্যা চল্লিশ হাজার। কিন্তু এখানে ষোল জনের এই রোগ ধরা পড়েছে। এত বেশি অ্যাক্রোম্যাট পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অধ্যাপক পিকফের্ড আমায় আরও বলেছিলেন, সূর্যকানারা অন্ধ নয় এবং তারা কোনো দিন অন্ধ হবেন না। এদের চোখের মণি সর্বদা ঘোরে। চোখের মণিটা স্থির করে সূর্যের সবকটা রং দেখতে পায় না। এই রোগ বংশগত কারণে হয়ে থাকে। একই পরিবারের সবারই কিন্তু এ রোগ হয় না।

অধ্যাপক পিকফোর্ড ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে আংশিক রংকানাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আংশিক রংকানার সংখ্যা অনেক বেশি। চোখের এই ধরনের ব্যারাম নিয়ে হেরেডিটি ও জেনেটিকসের গবেষকরা এখন নানা ধরনের গবেষণা চালাচ্ছেন বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

46A, রবার্ট স্ট্রীট, কল-12

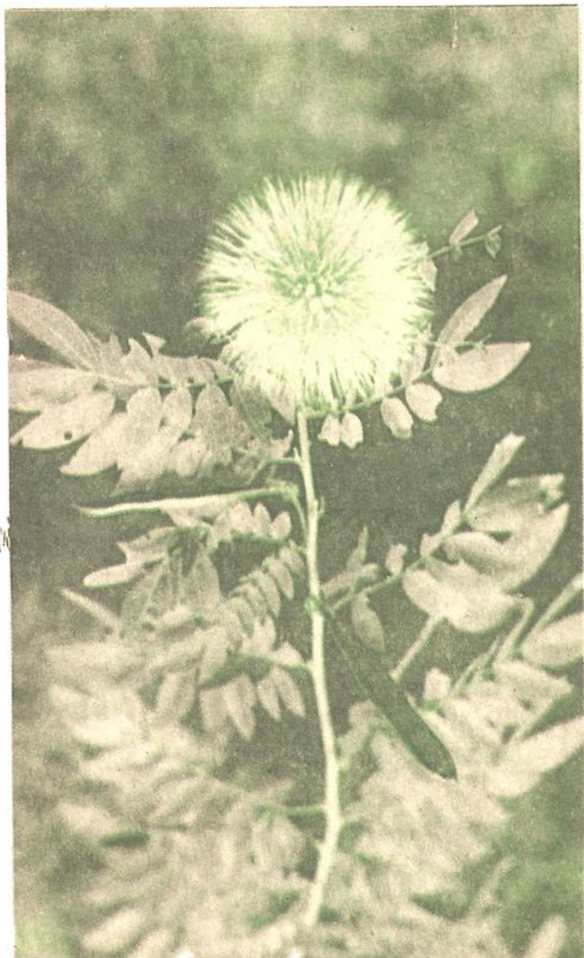

মনিকুন্তলা

এণাক্ষী বিশ্বাস

মণিকুন্তলা বিদেশী উদ্ভিদ হলেও আজ কলকাতা ও শহরতলীর বাগানে এদের দেখা মেলে। এই উদ্ভিদটির প্রধান সৌন্দর্য এর ফুল। ফুলগুলি দেখতে অনেকটা ছোট ছোট লাল টুকটুকে পাউডার পাফের মত। তাই ত ইংরাজীতে এর নাম পাউডার পাফ। বাংলায় মণিকুন্তলা আবার পাউডার পাফও বলে। বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালিয়েন্ড্রা হেমাটোসেফালা (Calliandra haematocephala)। বৈজ্ঞানিক নামটি গ্রীক শব্দ। 'ক্যালিয়েন্ড্রা' শব্দটির অর্থ সুন্দর পুং স্তবক, 'হেমাটো কথার অর্থ রক্ত রাঙা লাল এবং 'সেফালা' কথার অর্থ মস্তক অর্থাৎ ফুলের মস্তকটি সুন্দর রক্ত রাঙা লাল পুং স্তবক গুচ্ছের বিন্যাস। প্রকৃতই দেখা যায় অসংখ্য লাল রঙের পুংকেশরের অর্দ্ধ-গোলাকার বিন্যাসই ফুলটিকে ছোট সুন্দর লাল রঙের পাউডার পাফের আকৃতি দান করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই উদ্ভিদটি বর্ণনা করেন জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Jestus Karl Hasskarl এবং মাইমোসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই উদ্ভিদটির আদি নিবাস গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকায়।

শরৎকালে গাছে ফুল আসে। শীত পর্যন্ত প্রাচুর্য থাকে। অতঃপর ধীরে ধীরে ফুলের পরিমাণ কমতে থাকে। বর্ষা প্রারম্ভে আর ফুল থাকে না। যখনই গাছটি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, তখনই মনোরম শোভা বিস্তার করে।

এই উদ্ভিদটি মাঝারি আকৃতির গুল্ম বিশেষ। দুই থেকে চার মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ঝোপ ধরনের হয়। শাখা-বিন্যাস সুসমঞ্জস, পাতা একান্তর, দ্বিপক্ষল যৌগ পত্র—যেটি গোত্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে। প্রতিটি পক্ষলে 8 থেকে 10টি জোড়া পত্রক থাকে। পত্রকগুলি চকচকে ঘন সবুজ রঙের হয়। ফুল কাক্ষিক মস্তক গোলাকার কিন্তু যখন ফুলটি প্রস্ফুটিত হয় তখন ফুলের মস্তকটি অর্দ্ধ গোলাকার হয়। পুষ্পদণ্ডযুক্ত, পুংকেশর অসংখ্য, লম্বা, রোমশ, গাঢ় লাল রঙের হয়। ফল ছোট, পাতলা শিম্ব হয়। একটি মাত্র গর্ভপত্র থেকে জন্ম। গর্ভাশয় অধিগর্ভ ও এককোষ বিশিষ্ট। ফলটি পরিপক্ক হলে ফলত্বকের দুই প্রান্ত ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে।

এই বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। আবার কাণ্ড 'কাটিং' এর সাহায্যেও নতুন গাছ হতে পারে।

এই ফুল গাছটি আলিপুর এগ্রিহর্টিকালচার উদ্যানে, বিধান শিশু উদ্যান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উদ্যান, বেসরকারি বাড়ির বাগানে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় শোভা বর্ধ্বন করে চলেছে।

এই উদ্ভিদটির অনেকগুলি প্রজাতি বাগানের শোভা বিস্তার করে। তার মধ্যে গোলাপী রঙের ওল্টানো ছাতার আকৃতি বিশিষ্ট ফুলটি বেশি দৃষ্টি আকর্ষক উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালিয়েন্ড্রা সুরিয়ামেনসিস্।

ছবি :—সুবলচন্দ্র দে

শব্দকূট

চঞ্চল অধিকারী

পাশাপাশি

2. পাইন গাছের রেচন পদার্থ। 5. একপ্রকার রক্তবাহ; 7. মানবদেহের একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ; 11. একটি মেসোফাইট উদ্ভিদ; 12. মানবদেহের একটি শ্বাসঅঙ্গ; 13. প্রাণীর একটি বর্জ্য পদার্থ; 16. এক প্রকার উৎসেচক; 18. এক প্রকার শৈবাল; 20. একটি এককোষী প্রাণী।

উপর-নিচ

1. একটি সুষম খাদ্য; 3. রক্তরসের একটি অন্যতম উপাদান; 4. ভাইরাস ঘটিত একটি রোগ; 6. এক প্রকার ন্যাস্টিক চলন; 7. একটি লুপ্ত প্রায় প্রাণী; 8. হৃৎপিন্ডের একটি প্রধান অংশ; 9. জীবের একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য; 10. শিরার উৎসস্থল; 14. ক্লোরোফিল যার দ্বারা সক্রিয় হয়; 15. একটি ফাইটো হরমোন; 16. অযৌন জননে-র একক; 17. একটি গৌণ জলজ প্রাণী; 19. একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

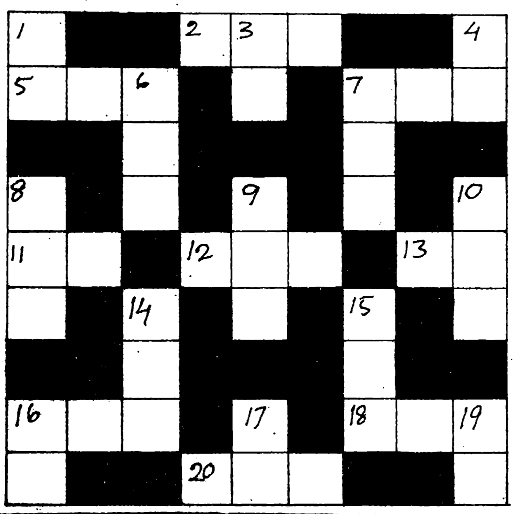

আই কিউ টেস্ট

ডিসেঃ '87

1. বন্ধনীর মধ্যস্থিত লুপ্ত সংখ্যাটি কত?
   532(630)217, 648(—)444
2. কোন সংখ্যাটি বেমানান?
   25, 125, 225, 625
3. মিল্ক সুগার কোনটি?
   (a) গ্লুকোজ, (b) ফ্রাকটোজ, (c) ল্যাকটোজ
4. PUFA কথাটির অর্থ কি?
5. একটি গাড়ি প্রথম দু'ঘণ্টায় গেল 20 মাইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টায় মোট 33 মাইল, তৃতীয় ও চতুর্থ ঘণ্টায় মোট 42 মাইল। গাড়িটি যদি শুধু চতুর্থ ঘণ্টায় 18 মাইল গিয়ে থাকে, তাহলে প্রথম ঘণ্টায় গাড়িটি গেছে—
   (a) 10, (b) 11, (c) 12, (d) 13

কুইজ কনটেস্ট সমাধান

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত গ্রেড-1-এর সমাধান

1. লর্ড ক্যানিং। 2. লে। 3. জবার পাতার উপপত্র থাকে বলে। 4. গোচো (GAUCHO)। 5. মাদ্রাজের দক্ষিণে। 6. আফ্রিকার হাতি। 7. ইলেকট্রন। 8. জগদীশচন্দ্র বসু। 9. আইস হকি। 10. বাঘ। 11. কর্পূর। 12. সোডিয়াম।

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত গ্রেড—II-এর সমাধান

1. পূর্ণিমা। 2. ক্যালিফোর্নিয়ার 'গোল্ডেন গেট ব্রিজ'। 3. ইজরাইল। 4. RIYAL। 5. কে. এম. কারিয়াপ্পা। 6. 12 ভোল্ট। 7. ইউরেনিয়াম। 8. CONES। 9. ইস্পাত। 10. কালো। 11. প্রাণিজ প্রোটিন। 12. গম এর।

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত গ্রেড—III-এর সমাধান

1. 1904 খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম সিমেন্টের পণ্যোৎপাদন শুরু হয়। 2. শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। 3. নেপাল। 4. ফ্র্যাঙ্ক (Franc)। 5. সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল-এ। 6. আয়োডিন। 7. নাইট্রিক অ্যাসিড। 8. ফসফরাস। 9. λ (ল্যাম্বডা)। 10. হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। 11. 4°C। 12. KLAPROTH, MARTIN HEINRICH.

সেপ্টেম্বর '87 এর আই-কিউ টেস্টের উত্তর

1. (d) নাগাড়ে কঠিন পরিশ্রম করে যেতে হবে।
2. যে সব ইংরেজ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রথম গিয়েছিলেন।
3. স্বর (note) বলে। 4. (b) র‍্যাডন। 5. (d) 12।

শব্দকূট সমাধান

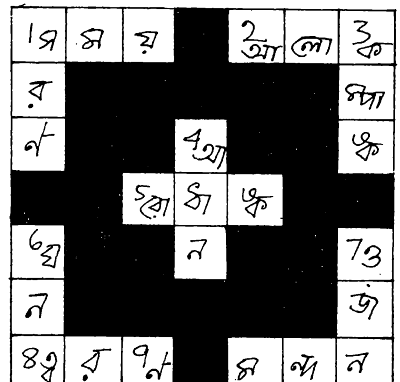

1987 শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট এর সমাধান

1. Asian Development Bank. 2. Bengal Nagpur Railway বা সংক্ষেপে বি. এন. আর। 3. $\sqrt{13}$। 4. সুইডেন 5. বার্লিন 6. অক্সিজেন 7. ট্রিপল অ্যান্টিজেন। 8. জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। 9. উইলিয়াম জোনস 10. বৈকাল হ্রদ। 11. হরিয়ানা রাজ্যের গুরগাঁও নামক স্থানে। 12. পূর্বতন বি. এন. আর, বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। 13. ফ্রান্সিস ডে 14. শাহনামা রচনা করেছিলেন ফেরদৌসি। 15. Kakrapar (গুজরাট)। 16. Computerised Arial Tomography. 17. Magnetic esonance Imaging. 18. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 19. 1690 20. প্রেমেন্দ্র মিত্র

1987 শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সুপার আই-কিউ টেস্টের সমাধান

1. 384 2. A হকি B. লন টেনিস C. হর্স রেসিং D. গল্ফ E. এয়ার রেসেস। 3. 32 4. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীকে রক্ষা করার জন্য নির্মিত এক সারি দুর্গকে Maginot Line বলা হতো। 5. 13935 6. (c) অ্যালুমিনিয়াম 7. ইউরেনিয়াম-235, ইউরেনিয়াম 233 এবং প্লুটোনিয়াম 239। 8. (c) অপরিবর্তিত থাকতো। 9. (d) ব্যতিচার 10. (b) বিশুদ্ধ জল।

1987 শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সংখ্যার ধাঁধার সমাধান

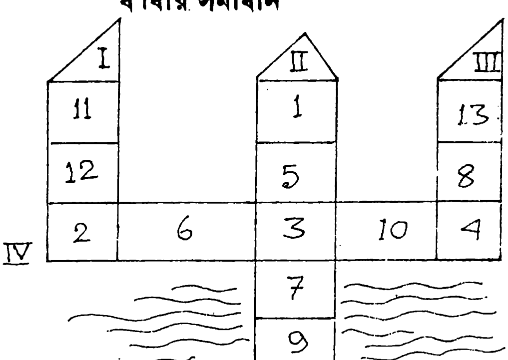

1987 শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ফটো ক্যুইজ এর সমাধান

1. PYRITE. 2. খৈরি 3. SPIDERWORTS

1987 শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অঙ্কের ধাঁধার এর সমাধান

1. বলার ধরনে মনে হচ্ছে, দাদু আর নাতির মধ্যে নিছক ঠাট্টা। আসলে দুজনেই সত্যি কথা বলেছে। দাদুর জন্মসাল 1866 আর নাতির জন্মসাল 1916 খ্রীস্টাব্দ।

2. কোন ভোজবাজি নয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ বক্র, গোলাকৃতি। তার উপর দ্রাঘিমা রেখাগুলি ক্রমশঃ মেরু-বিন্দুর দিকে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এর ফলে প্রথমে পশ্চিমের ও পরে পূবের সমান অক্ষরেখাংশ কেন্দ্রে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে না। এই কারণেই বিমানটি ঘাঁটি থেকে একটু দূরে নেমেছে।

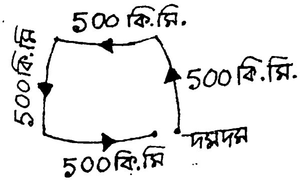

সমস্যা-3এর সমাধান →

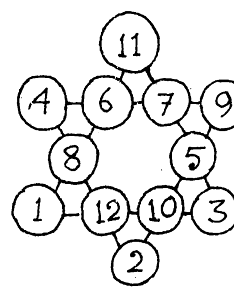

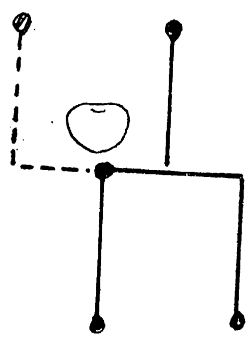

← সমস্যা-4এর সমাধান

সমস্যা-5এর সমাধান →

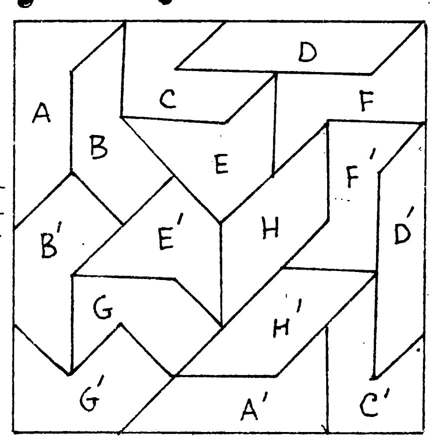

সেপ্টেম্বর '87'-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা সুশান্ত চক্রবর্তী, **24-পরগনা** ঃ বুনু নিয়োগী, **হুগলী** ঃ দেবমাল্য যশ, **বর্ধমান** ঃ মৌ দত্ত, **মেদিনীপুর** ঃ সুমন্ত নারায়ণ দত্ত।

সেপ্টেম্বর '87-প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সর্বাধিক সংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **অনুপম সরকার** (সঠিক উত্তর সংখ্যা II) কাটাপুকুর, মগরা, জেলা—হুগলী।

2. **কিংশুক সেন** (সঠিক উত্তর সংখ্যা 10) প্রযত্নে, কে. এম. সেন কোঃ নং-সি. এন 48, কোক ওভেন কলোনি, দুর্গাপুর-2, বর্ধমান-713202।

3. **সুদীপ শীল** (সঠিক উত্তর সংখ্যা 10) প্রযত্নে, দুলালচাঁদ শীল, 151, ঘুটিয়া বাজার, পোস্ট—হুগলী, জেলা—হুগলী।

সেপ্টেম্বর '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ নন্দিনী চক্রবর্তী, **হুগলী** ঃ উৎপল শেঠ, রাজেশ শেঠ, **মুর্শিদাবাদ** ঃ সঞ্জয়কুমার সেন।

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-1987, বিশেষ-প্রতিযোগিতা ফটো ক্যুইজ-এর ফলাফল ঃ

1. **প্রথম ঃ শিবাশিস সরকার** (দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে সুধাময় সরকার, আপার চেলিডাঙ্গা আসানসোল-4, বর্ধমান।

2. **দ্বিতীয় ঃ দেবজ্যোতি সাধু** (দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, গোপালচন্দ্র সাধু, গোপাল গড়, পোস্ট বনগ্রাম জেলা—উত্তর 24, পরগনা।

3. **তৃতীয় ঃ কালাম হোসেন** (দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, মোবারক হোসেন, পুরাতন চক (ঘোরা সাইদ) বর্ধমান।

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987, বিশেষ প্রতিযোগিতা সুপার আই-কিউ-টেস্ট-এর ফলাফল ঃ

1. **প্রথম** ঃ মৃণালকান্তি বেরা (10টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, সুশান্তশেখর বেরা, গ্রাম—কানাশি বৃন্দাবন চক, পোস্ট—মাগুরি জগন্নাথ চক [পাঁশকুড়া আর, এস,] জেলা—মেদিনীপুর

2. **দ্বিতীয়** ঃ মিনতি ঘোষ (10টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) জয়রামপুর, শুকদেব পুর 24 গরগনা—743503

3. **তৃতীয়** ঃ মানব পিলসিমা (10টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, বৃন্দাবন পিলসিমা, 54, গৌরাঙ্গতলা লেন, পোস্ট—খাগড়া জেলা—মুর্শিদাবাদ-742103

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে ক্যুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VI-VII VIII, IX-X ও XI-XII। ফটো ক্যুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তরদাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

ডিসেম্বর সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড 1 **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প**

গ্রেড —2 **সমরজিৎ করের— পরমাণু গবেষণায় ভারত**

গ্রেড—3 **অমরনাথ রায়ের জ্ঞান বিজ্ঞানের মজার খেলা**

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..

....

বাড়ির ঠিকানা..............................

....

বয়স .... শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এ উত্তর পাঠালাম।

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987, বিশেষ প্রতিযোগিতা—সুপার কুইজ কনটেস্ট-এর ফলাফল ঃ

1. **প্রথম ঃ সুব্রতেশ রায়** (20টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, সুধীর কুমার রায় ইন্দা, (টায়ার হাউসের কাছে, পোস্ট—খড়্গপুর, জেলা—মেদিনীপুর।

2. **দ্বিতীয় ঃ কুশকুমার বেহেরা** (18টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, গুণনিধি বেহেরা, 16, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-700003।

3. **তৃতীয় ঃ লবকুমার বেহেরা** (18টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, গুণনিধি বেহেরা, 16, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-700003।

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987, বিশেষ প্রতিযোগিতা—সংখ্যার খেলার ফলাফল ঃ

প্রথম ঃ শমিতা বসু প্রযত্নে সৌমেন্দ্র নাথ বসু, সাধনপুর হাউসিং এস্টেট ব্লক-H 1, পোস্ট—বর্ধমান, জেলা—বর্ধমান।

2. **দ্বিতীয় ঃ সুব্রতেশ রায়** প্রযত্নে, সুধীরকুমার রায়, ইন্দা (টায়ার হাউসের কাছে), পোস্ট—খড়্গপুর, জেলা—মেদিনীপুর।

3. **তৃতীয় ঃ শৌভিক রায়চৌধুরী** করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট, ব্লক—C-4, ফ্ল্যাট নং-10। বিধাননগর, কল—7(0001

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের '87 বিশেষ প্রতিযোগিতা—বুদ্ধিশুদ্ধি-র সঠিক উত্তর দিয়ে যারা গ্রাহক হলো ঃ

1. **সোমেন প্রামাণিক** প্রযত্নে, বিকাশ চন্দ্র প্রামাণিক, গ্রাম ও পোস্ট—ডোমজুড়, জয়চণ্ডীতলা, হাওড়া-711405

2. **বিশ্বপ্রিয় চন্দ্র** প্রযত্নে, গৌরহরি দাস, লালকুঠি পাড়া, সিউড়ি, বীরভূম।

3. **অর্ণব ব্যানার্জী** সোদপুর হাউসিং এস্টেট, ব্লক—'K', ফ্ল্যাট নং 15, পোস্ট—সোদপুর, উত্তর 24 পরগনা

4. **সোনালী চৌধুরী**, 5/2, লক্ষ্মণদাস লেন, হাওড়া-1

5. **সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী**, পুলিশ কোয়াটার F—K 1/14, 0, দমদম রোড, কলকাতা—700030

6. **অলোক কুমার চক্রবর্তী**, সিউড়ি বেণীমাধব ইন্সটিটিউশন, পোস্ট—সিউড়ি, জেলা—বীরভূম

7. **সৌমিত দাস** প্রযত্নে, সত্যেন্দ্রনাথ দাস, চক ভবানী, পোস্ট—বালুরঘাট, জেলা—পঃ দিনাজপুর 733101

8. **অদিতি পাল**, 52, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-1

9. **সোমেন জানা** প্রযত্নে, চুনীলাল জানা, গ্রাম—কাউকুণ্ড, পোস্ট—দঃ কাশিম নগর, জেলা—মেদিনীপুর।

10. **সজল দলপতি** প্রযত্নে, অবনীকান্ত দলপতি, পোস্ট—আন্দুল মৌরী, গ্রাম—আন্দুল পূর্বপাড়া, জেলা—হাওড়া 711302

11. **মধুমিতা দাস** প্রযত্নে, অমিতাভ দাস, E/14, হাউসিং এস্টেট, বালটিকুরি হাওড়া-711402।

12. **অমিত ঘোষ** প্রযত্নে, গীতা ঘোষ, M.I.G. হাউসিং এস্টেট, সোদপুর, নীলগঞ্জরোড উঃ 24 পরগনা।

13. **সুব্রত কুমার জানা** প্রযত্নে, সত্যেশ্বর জানা, গ্রাম—নোনাকুড়ি, পোস্ট—বল্লুক, জেলা—মেদিনীপুর।

14. **জয়ন্তকুমার চৌধুরী** প্রযত্নে, পি. সি. চৌধুরী 4, দেশবন্ধু নগর কলোনী, পোস্ট—সোদপুর জেলা—উঃ 24 পরগনা।

15. **শুভাশিস মণ্ডল** প্রযত্নে, হরিকালী মণ্ডল, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, বড়জোড়া শাখা, পোস্ট—বড়জোড়া, জেলা বাঁকুড়া 722202।

16. **অভিজিৎ ঘোষ** প্রযত্নে, কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, দিনেমা ডাঙ্গা গড়ঃ কোয়ার্টার ফ্ল্যাট নং-C3/13, পোস্ট—গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, জেলা—হুগলী 712137।

17. **অমিতাভ রায়** প্রযত্নে, ডি. বি. রায় কোয়ার্টার টাইপ III/B-41, HFC কলোনী, দুর্গাপুর-12 জেলা—বর্ধমান।

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান 1987, বিশেষ প্রতিযোগিতা—অঙ্কের ধাঁধার ফলাফল ঃ

1. **প্রথম ঃ তন্ময় মহাপাত্র** (4টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 56/F বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা 10

2. **দ্বিতীয় ঃ সোমেন ভৌমিক** (4টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) পঞ্চানন ভৌমিক, 102, কালীবাড়ি ১ম গলি, নব ব্যারাকপুর পোস্ট—নবব্যারাকপুর, জেলা—24পরগনা

3. **তৃতীয় ঃ শুভ্রাংশু রায় C/0**, পরেশ চন্দ্র রায় গ্রাম ও পোস্ট—গুশকরা (স্কুল মোড়) জেলা—বর্ধমান

শারদীয় 'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতার উত্তর

এক ঃ বলটি যে কোন পায়েই ভাবা যেতে পারে।

দুই ঃ CALCUTTA

তিন ঃ একটি কুকুরের ছবির আলো-ছায়াকে মোটা করে আঁকা। দূর থেকে দেখলে বোঝা যাবে।

নিজে নিজে কর

মাল্টিপারপাস অ্যালার্ম / শঙ্করপ্রসাদ দেবনাথ

আজকে যে যন্ত্রটির কথা বলব তাকে অনায়াসেই যে কোনও রকম অ্যালার্মিং সার্কিটে ব্যবহার করা যায়। এটি মূলত একটি বাইস্ট্যাবল মালটিভাইব্রেটর।

ফায়ার অ্যালার্ম; টাইমিং অ্যালার্ম; স্টেডীহ্যাণ্ড টেস্টার; ডোর বেল, সব রকম ভাবেই এই অডিও অসিলেটারটিকে ব্যবহার করা যায়। আবার দরকার হলে একে ইলেকট্রনিক অরগ্যান বা পিয়ানোও করে নেওয়া যায়।

আমরা যে সব শব্দ শুনে থাকি, তাদের প্রত্যেকটিই অপরটি অপেক্ষা পৃথক। কেননা প্রত্যেক শব্দেরই এক-একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সী থাকে। এখানে যে যে রেজিস্টর ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের

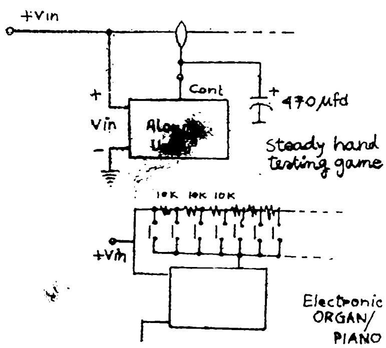

প্রত্যেকটির ভ্যালুর ওপরই নির্ভর করে অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সী। এই অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সীকে নিম্নলিখিত পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়ঃ

$$f = \frac{1400}{(R_1.C_1)+(R_2+VR_1.C_2)};$$

সাধারণত আর সব কম্পোনেন্টস ফিক্সড বলে VR_1 এর সাহায্যেই tone কে কন্ট্রোল করা হয়। এবার এই যন্ত্রটিকে কিভাবে নানা ধরনের অ্যালার্মিং সার্কিটে ব্যবহার করা যাবে তা দেখান হলঃ

সার্কিট অনুযায়ী এই যন্ত্রটি তৈরি করতে 25 টাকা পড়বে। অসুবিধা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার।

Parts list ঃ

T_1, T_2—BC 148 B T_3—TL100B. R_1—2·2K. R_2—1KΩ. VR_1—100KΩ.Pot. R_4, R_3—1·2KΩ C_1, C_2—·5Ωfd. R_5—82Ω L.S—8Ω or 16Ω Loud Speaker.

c/o, এইচ দেবনাথ, 5B রাজা রাজনারায়ণ স্ট্রীট, কলি-9

সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্

ঘুম-পাড়ানি সঙ্গীত

অপরাজিত বসু

বিনা খরচে ঘুম-পাড়ানি বাজনা শুনতে চাও? কি করে তা সম্ভব? আমার পরামর্শ শোন—তাহলেই ঘুম-পাড়ানি শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসবে।

তোমাদের বাড়িতে কি পানের বাটা আছে? তাহলে নিশ্চয়ই চুন আছে। একটা চীনামাটির কাপে ঐ চুনের ওপরের জল নাও একটু, প্রয়োজনে জল মিশিয়ে চুনের জলকে পাতলা করে নিতে পারো! এবার একটা সিগারেটের বাক্সের পাতলা রাঙতা জোগাড় করো। রাঙতাটাকে দু'-টুকরো করে দু'ভাগেই পাতলা চুনের জল লাগিয়ে দাও। তারপর রাঙতা টুকরো দুটোকে মুড়ে দু'কানের ভাঁজে বসিয়ে

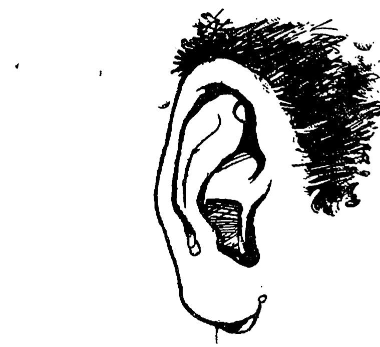

দাও (সাবধান! কানের ভেতরে দিও না, কানের বাইরের দিকের খোঁদলে বসাবে)।

কি, কিছু শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, কিরকম কিড়্ কিড়্-মিড়্ মিড়্ আওয়াজ হচ্ছে যেন! আওয়াজ হচ্ছে তো হচ্ছেই—থামে না। মৃদু ঘুমপাড়ানি সুরে কিড়্ কিড়্ আওয়াজে ঘুম আসছে যে!

কিভাবে কাজ হচ্ছে? পাতলা রাঙতাটা অ্যালুমিনিয়াম—তার সঙ্গে চুনের জল (ক্ষার) বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করছে। হাইড্রোজেন অণুগুলি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামে ধাক্কা দিয়ে কিড়্ কিড়্ আওয়াজ তুলছে! গ্যাসীয় অণুদের যে গতিশক্তি আছে তার প্রমাণ এভাবে পাওয়া যায়। অণুদের ধাক্কায় এত মৃদু শব্দ হচ্ছে যে তা কানের গোড়ায় নিয়ে না এলে শোনা সম্ভব নয়। (যাদের শ্রবণশক্তি ভালো, তারা রাঙতার টুকরোকে কানের খোঁদলে না বসিয়ে স্রেফ কানের কাছে এনেই শব্দ শুনতে পাবে।)

বি 16/8 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলি-89।

'কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ' আয়োজিত নবম/দশম শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

দারুণ ভেল্কি / দেবেশ দাস

আমাদের ক্লাসে একটি নতুন ছাত্র এসেছে। ছেলেটির নাম গৌতম। প্রথম দিন এসেই সে বলল, "কাল তোমাদের একটা মজার জিনিস দেখাবো।" আমরা তো খুব উৎসুক হয়ে রইলাম। কাল দেখবো গৌতম আমাদের কেমন জিনিস দেখায়।

পরের দিন স্কুল বসল। আমি তো আগে থেকেই ওর ডানপাশের জায়গাটা দখল করে বসে আছি। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে বিচ্ছু ছেলে অনুপ ওর অন্য পাশে বসল। প্রথম পিরিয়ড আরম্ভ হল, প্রধান শিক্ষক ইংরাজী পড়িয়ে চলে গেলেন।

প্রধান শিক্ষক চলে যাবার পর আমরা সবাই গৌতমকে ছেঁকে ধরলাম—"কিরে, তোর মজার জিনিস কখন দেখাবি?" ও কোনো কথা বলল না, পরক্ষণেই একটু লাল রঙ শিশি থেকে বের করে তা ঢেলে দিল অনুপের জামায়।

বেচারা অনুপ, এই গতসপ্তাহে নতুন জামাটা করিয়েছে, তার উপর লাল রঙ ঢালায় গৌতমের উপর গেল ক্ষেপে। তখন কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললো প্রধান শিক্ষকমশায়ের ঘরের দিকে।

প্রধান শিক্ষক সিদ্ধেশ্বরবাবু একমনে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত জটিল কাজ করছিলেন। অরুপ কোনো কথা না বলে হুড়মুড় করে সেখানে ঢুকে তাঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটালো। সিদ্ধেশ্বরবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "কি হয়েছে রে?"

অনুপ কেঁদে কেঁদে বলল, "স্যার, আমার নতুন জামাটা ..." — ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, "কি হয়েছে সেটা বলবি তো রে হতভাগা!"

অনুপ বলল, "স্যার, আমার নতুন জামায় গৌতম লাল রঙ ঢেলে দিয়েছে।"

"কোথায় লাল রঙ?" সিদ্ধেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই তো স্যার দেখুন না।....আরে? লাল রঙটা গেল কোথায়? স্যার সত্যি বলছি এইখানেই গৌতম লাল রঙ ঢেলেছিল!"

"ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি! মিছিমিছি আমার কাজে অসুবিধা করা? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!"—বলে সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর বিখ্যাত ছড়িটি তুললেন।

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমি....আমি......"

"আর বলতে হবে না, তুমি ... তুমি একটা পাঁঠা ছাড়া আর কিছুই নও"—বল্লে সিদ্ধেশ্বরবাবু দিলেন কয়েক ঘা বসিয়ে।

আমরা এদিকে অনুপের অপেক্ষায় বসে আছি। আজ নিশ্চয় গৌতমের ভাগ্যে মার আছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি কাঁদতে কাঁদতে অনুপ ক্লাসে ঢুকছে, আর তার হাতে পিঠে ছড়ির কালো দাগ। ওর এই অবস্থা দেখে আমরা যা অবাক হলাম, তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম তার জামায় লাল রঙটা না দেখতে পেয়ে। সবাই ছুটে গেলাম অনুপের কাছে—ব্যাপারটা কি? অনুপ বেচারা রাগের মাথায় আমার গালে দিল একটা চড় বসিয়ে। কে জানতো, তার বরাতটা এত খারাপ? দোষ করল গৌতম, আর মার খেলো কিনা অনুপ!

এমন সময় আমাদের ভৌতবিজ্ঞানের স্যার জগৎবাবু এলেন। তিনি গণ্ডোগোল দেখে বললেন, "কি ব্যাপার? ....এত গণ্ডগোল কিসের?" আমি সাহস করে জগৎবাবুকে সব ঘটনাটা বললাম। সত্যি বলতে কি, অনুপের জামার লাল রঙটা না দেখতে পেয়ে খুব অবাক হয়েছিলাম আমরা।

সব শুনে জগৎবাবু একটু হেসে বললেন, "গৌতম তোমাদের বোকা বানিয়েছে। ফিনপথ্যালিন দ্রবণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড মেশালে তা লাল বা বেগুনী বর্ণের হয়। এই রঙীন দ্রবণ কাপড়ে ছিটিয়ে দিলে বাতাসে ফিনপথ্যালিন দ্রবণের অ্যামোনিয়া বাষ্পায়িত হতে থাকে ও ধীরে ধীরে লাল বর্ণ বর্ণহীন হয়ে যায়। আর গৌতম এই লাল দ্রবণই অনুপের জামায় দিয়েছে। পরে তা বর্ণহীন হয়ে গেছে বলে কোনো লাল রঙ জামায় দেখতে পাওনি।....আর অনুপ, তোমার দুঃখ করার কারণ নেই, আজ তোমরা একটা নতুন জিনিস শিখলে, গৌতম তোমাদের সত্যিই মজার জিনিস দেখালো।"

গৌতম তখন আমাদের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসি হাসল।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রণব বিদ্যাপীঠ, ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ 24 পরগনা, পিন-743331।

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের প্রশ্নের উত্তর

রেল লাইনে ফাঁক থাকে কিন্তু ট্রাম লাইনে ফাঁক থাকে না কেন ?

ট্রাম লাইনের পাত রেল লাইনের মত লোহার তৈরি হলেও সেই পাত মাটির উপর না থেকে মাটিতে পোঁতা থাকে। তাছাড়া ওর চারদিকে থাকে গ্রানাইট পাথর ও কংক্রীট। উক্ত কারণে তাপমাত্রার পার্থক্যের প্রভাব ট্রাম লাইনের উপর খুব কমই পড়ে। তাই ট্রাম লাইনের পাত রেল লাইনের মত প্রসারিত হয়ে বেঁকে যেতে পারে না। আর ঐ কারণেই ট্রাম লাইনে কোন ফাঁক রাখার দরকার হয় না।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন

সমুদ্রের জল লবনাক্ত কেন ?

জানতে চেয়েছে (1) মিতালি বসু, শেওড়াফুলি, হুগলী।

প্রঃ গিরগিটিরা কেমন করে দেহের রঙ বদলায় ? (1) মৌসুম রায়, চাঁপাডাঙা, হুগলী। (2) অমিয় কুমার পাল, বাঘাসন, মালডাঙা, বর্ধমান। (3) চন্দন মুখোপাধ্যায়, সাঁইথিয়া, বীরভূম।

উঃ গিরগিটি জাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী—যাদের সাধারণতঃ বহুরূপী বলা হয়, তারাই গায়ের রঙ বদলাতে পারে। আর এই ব্যবস্থাটি অবলম্বন করে—শত্রুর চোখে ধূলো দিতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে।

বহুরূপীদের অবশ্য চামড়ায় যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে, তাতে থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু। ঐ রেণুগুলো এমনই যে, তাদের উপর আলো পড়লে প্রতিফলিত হয়ে সাদা রঙ সৃষ্টি করতে পারে। অপর পক্ষে তাদের চামড়ার কিছু কিছু কোষে লালচে বা বাদামী রঙের রঞ্জক পদার্থও থাকে। বহুরূপীরা যখন গা নাড়া দেয় তখন গায়ের চামড়া সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে রঞ্জক পদার্থগুলোও নড়াচড়া করতে থাকে। অনুরূপ অবস্থায় সৃষ্টি হয় নানা ধরনের রঙ।

দেখা গেছে, দেহ সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে চামড়ার উপরে সমূহ রঞ্জক পদার্থগুলি চলে এলে বহুরূপীকে কালো দেখায়। সেগুলি চামড়ার একটু নিচের দিকে থাকলে দেখায় সবুজ এবং যে অংশে রঞ্জক পদার্থ থাকে না তেমন অংশের চামড়ার রঙ হয় হলদে।

প্রঃ মশা যেখানে কামড়ায় সে অংশটা ফুলে উঠে কেন? সুরজিৎ পাণ্ডা, পাঁচমারী, বাঁকুড়া।

উঃ মশা যখন কামড়ায় তখন হেপারিন নামে এক ধরনের যৌগিক পদার্থ রক্তে চালান করে দেয়। ঐ হেপারিন কিন্তু অবিকৃত থাকতে পারে না। প্রবেশ করার পর একরকম সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার কোষগুলোর সঙ্গে ক্রিয়া শুরু করে দেয় এবং গঠন করে এক ধরনের প্রোটিন। ঐ প্রোটিন আবার দেহের পক্ষে বেজায় ক্ষতিকর। তাই ওকে ধ্বংস করার জন্য রক্তে আপনা হতে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি এবং ঐ অ্যান্টিবডি তৎক্ষণাৎ ওকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসে। ফলে শুরু হয় ক্ষতিকর প্রোটিন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ রক্ত চলাচল বেড়ে উঠে এবং স্থানটি ফুলে উঠে ও লাল দেখায়। উক্ত প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় ইনফ্লামেশন।

প্রঃ আকরিক কী পাথরকে বলা হয় ? বাঞ্ছানিধি দারি, 29, রামমোহন দত্ত রোড, কলিকাতা-20।

উঃ যে কোন পাথরকে আকরিক বলা যাবে না। প্রকৃতিতে অধিকাংশ ধাতুকে যৌগরূপে পাওয়া যায়। ঐ ধাতব যৌগগুলি ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূগর্ভে পাথরের আকারে পাওয়া যায়। এদের সাধারণতঃ খনিজ বলা হয়। আর যে সমস্ত খনিজ থেকে অত্যন্ত সহজ উপায়ে এবং কম খরচে ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় তেমন খনিজকে সেই ধাতুর আকরিক বলা হয়। যেমন, ভূপৃষ্ঠের সাধারণ বেলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম যৌগ হিসাবে বিদ্যমান। কিন্তু সেই মাটি থেকে সহজভাবে এবং অল্প খরচে অ্যালুমিনিয়ামকে নিষ্কাশন করা যায় না। তাই তেমন মাটিকে আমরা অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বলবো না।

প্রঃ জলকে সনাক্ত করার সহজ উপায় কী ? শোভন পাত্র, কাঁথি, মেদিনীপুর।

উঃ নীল তুঁতের দানা বা কপার সালফেটকে উত্তপ্ত

করলে একসময় নিরুদক সাদা কপার সালফেটের সাদা গুঁড়োয় পরিণত হবে। ঐ সাদা গুঁড়া যে তরলের সংস্পর্শে এলে নীল হয়ে যাবে সেই তরলটাই জল।

প্রঃ Insat (ইনস্যাট) এর পুরো নাম কী? নূর জামাল, পাইকর, বীরভূম।

উঃ এটি একটি ভারতীয় প্রকল্প। পুরো নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল স্যাটেলাইট (Indian National Satellite)। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে (1) গ্রামাঞ্চলে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার, (2) আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, (3) জরুরী বেতার যোগাযোগ স্থাপন, (4) টেলি যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি নানা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের মূলে আছে অপরাপর দেশের মত ভারতেরও নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করা। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ঠিক করা হয়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে নিজস্ব জায়গা দখল করার জন্য নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবহার করতে হবে। সময় খুব বেশি না পাওয়ার জন্য নিজস্ব জায়গা দখল করতে বাধ্য হয়ে ভারতকে বিদেশ থেকে উপগ্রহ কিনে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে উপগ্রহগুলো তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভারতীয় নক্সার উপর ভিত্তি করে।

আমেরিকার ফোর্ড অ্যারোস্পেস্ কর্পোরেশনের সহযোগিতায় 1982 সালের 10 এপ্রিল এবং 1983 সালের 31 আগস্ট পরপর দুটি উপগ্রহকে মহাকাশে স্থাপন করে ভারত। প্রথমটির নাম ইনস্যাট 1এ এবং দ্বিতীয়টির নাম ইনস্যাট বি। প্রথম উপগ্রহ ইনস্যাট 1এ তে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে। ফলে সেটির আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ইনস্যাট 1বি র ক্ষেত্রে ঐ সব ত্রুটিগুলি দূর করায় এটি এখনও কর্মরত অবস্থায় আছে এবং বেশ কিছুকাল ধরে কাজ করে যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতবর্ষেই যাতে এই ধরনের উপগ্রহ তৈরি হতে পারে তার জন্য পরিকল্পনামত কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইনস্যাটের সংস্করণে তৈরি হতে চলেছে প্রোটো ইনস্যাট।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে দূরত্ব পরিমাপক উপগ্রহ বা IRS (Indian Ranate Seving Satelite) সৌর সমলয় কক্ষপথে স্থাপন করা। এতে থাকবে অত্যাধুনিক পুসব্রম ক্যামেরা। এর সাহায্যে আলোক ও অবলোহিত তরঙ্গের মাধ্যমে ছবি নিতে অসুবিধা হবে না।

প্রঃ পৃথিবীর আয়তন ও ওজন কত? খনিরু জামান, কলসুর, 24 পরগনা।

উঃ ভূপৃষ্ঠের আয়তন 1969,50,000 বর্গমাইল এবং ওজন 66 কোটি টন।

প্রঃ D. N. A. কী? অনির্বাণ লাহা, পাত্রসায়ের বাঁকুড়া।

উঃ অ্যাডেনিন, গুয়েনিন, সাইটোসিন ও থাইনিন নামক চার রকমের জৈব ক্ষারক দিয়ে গঠিত জীবকোষের একটি উপাদান ডি. এন. এ. বা ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড।

প্রঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কেমন করে হয়েছে? বাদল দত্ত, বিরহী, নদীয়া।

উঃ অকল্পনীয় মহাবিশ্বে কত সহস্র সহস্র কোটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি যে আছে তার সঠিক হিসেব করা মানুষের শক্তির বাইরে। এইটুকু জানা গেছে যে, মহাবিশ্ব প্রসারণশীল। বর্তমানে প্রসারণ অব্যাহত আছে। তবে চূড়ান্ত প্রসারণের পর আবার সঙ্কুচিত হয় এবং সঙ্কোচনের মাত্রা যখন চরম হয় তখন মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুপিণ্ড সম্মিলিত হয়ে স্বল্প পরিসর স্থানে এক বিশাল জড়পিণ্ডের আকারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ঘনত্ব বেড়ে যায় অকল্পনীয়ভাবে এবং সঙ্কোচনও থামতে বাধ্য হয়। অবশেষে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য হয়, পুনরায় ব্রহ্মাণ্ড শুরু হয় প্রসারিত হতে এবং ছড়িয়ে পড়া সেই ঘনীভূত বস্তু পিণ্ডগুলি থেকে নতুন করে সৃষ্টি হয় এক একটি নক্ষত্র জগৎ। এইভাবে চলছে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস।

তবে একেবারে আদিতে মহাবিশ্বের প্রসার এতখানি ছিল না বলে আজকের বিজ্ঞানীদের অভিমত। তাঁদের মতে আদিতে এক ধরনের আদিম কণিকা থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমূহ বাসিন্দাদের সৃষ্টি। তবে সে কণিকা যে কী ছিল তা সঠিক করে কেউ বলতে পারছেন না।

আদিতে সেই আদিম কণিকা মহাবিশ্বের এক সীমাবদ্ধ স্থানে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। স্থানটির ব্যাস ছিল 20 থেকে 3 কোটি মাইল এবং ঘনত্ব ছিল বড় ভয়ানক জল অপেক্ষা 10^9 গুণ। ঐ প্রচণ্ড ঘনত্বে তাপমাত্রাও বেড়ে উঠেছিল ভয়ানকভাবে। অবশেষে পিণ্ডটি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল। আদিম পিণ্ড থেকে তখনই জন্ম নিয়েছিল ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকা এবং এদেরই বিপরীত কণিকা তথা অ্যান্টি পার্টিক্যাল গুলি। ব্রহ্মাণ্ডও তখন শুরু করে প্রসারিত হতে। ঐ কণিকাগুলি কালক্রমে রূপ নেয় পরমাণুর আকারে। অবশেষে এক এক জায়গায় ঘনীভূত হয়ে এক একটি গ্যালাক্সি এবং গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্রদের সৃষ্টি করেছে।

মতবাদটিকে বলা হয় "বিগ ব্যাং" মতবাদ এবং এটির প্রবক্তা জর্জ গ্যামো, উইৎসেকার প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা।

প্রঃ সুপারনোভা কাদের বলা হয়? বাবন মুখার্জী, মণিহারা, পুরুলিয়া।

উঃ এক ধরনের নক্ষত্রদের শেষ অবস্থাকে বলা হয় সুপারনোভা। সাধারণতঃ ছোট বা মাঝারি নক্ষত্রদের তেজের উৎস হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়ার মুখে আপন তেজকে অব্যাহত রাখতে কেন্দ্রের দিকে ধস নামিয়ে আনে। তখন আয়তন ছোট হয়ে যায় এবং তাপমাত্রা ও আবর্তন বেগ দুইই বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ অবস্থায় নক্ষত্রদেহের হিলিয়াম পরমাণুরাও অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে না। তারা ভারি মৌলে রূপান্তরিত হতে থাকে। এর প্রত্যক্ষ ফল নক্ষত্রদেহের ঘনত্ব বৃদ্ধি। অবশেষে নক্ষত্রদেহের ঘনত্ব এতখানি বেড়ে উঠে যে, সে আর নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারে না। এক সময় প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বস্তুপিণ্ডটি টুকরো টুকরো হয়ে মিশে যায় মহাকাশের বস্তুরাশির সঙ্গে।

তবে দেখা গেছে, বিস্ফোরণ যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন এবং যত টুকরো টুকরো হয়ে যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটা বৃহৎ পিণ্ড থেকে যায়। সেই পিণ্ডটির ঘনত্বও পূর্ববৎ থাকে। কিন্তু আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার জন্য আবর্তন বেগ বেড়ে উঠে। এক সময় সেই আবর্তন বেগ এত প্রবল হয়ে উঠে যে, ঘণ্টায় প্রায় এককোটি মাইলের মত হয়। এই সময় তার দেহ থেকে নির্গত হয় ভয়ঙ্কর ও শক্তিশালা রঞ্জনরশ্মি। এবং অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নক্ষত্রের শেষ জীবনে অনুরূপ অবস্থা এলে তাকে বলা হয় সুপারনোভা। প্রায় প্রতি বছর দূরবীনের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি নক্ষত্রকে অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হতে দেখেন।

পোঃ কালিন্দী, মেদিনীপুর।

বিজ্ঞানের খবর

হার্টের অসুখ বনাম যোগব্যায়াম

হার্টের অসুখ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য যোগব্যায়াম কতটা কার্যকর তা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা এক যৌথ কর্মসূচী নিয়েছেন। এ কাজে যুক্ত হয়েছেন মস্কোর প্রিভেনটিভ কার্ডিওলজি ইন্সটিট্যুট এবং দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে-এ গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য — রোগীর হৃদপিণ্ড, রক্ত সঞ্চালন, মনের ভাবগতিক এবং শরীরের স্নায়বিক ক্রিয়াকর্মের ওপর যোগব্যায়ামের সামগ্রিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা। যোগব্যায়ামের সাহায্যে হার্টের অসুখের রোগীদের সেরে ওঠার সম্ভাবনা কতখানি —অদূর ভবিষ্যতে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শাকসব্জী টাটকা রাখতে

ওজোন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং গামা-রশ্মির সাহায্যে শাকসব্জী ও ফলকে সাবেকী পদ্ধতির চেয়ে দশগুণ বেশি সময় ধরে তাজা রাখা সম্ভব। এই নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব সোভিয়েত ইন্সটিট্যুটের বিজ্ঞানীদের।

আলু কেন বাসি হয় সেটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে—মানুষের পক্ষে নিরাপদ মাত্রায় গামা-রশ্মির বিকিরণ যদি আলুর ওপর প্রয়োগ করা যায় তবে আলুতে কোনরকম জীবাণু সংক্রমণ তো ঘটেই না। সেই সঙ্গে আলু থেকে অঙ্কুরোদগমও বন্ধ হয়। গামা রশ্মির সাথে ওজোন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োগ করলে আলুর বস্তাগুলো জীবাণু-মুক্ত হয় এবং আলু কখনই বাসি হয় না। এ পদ্ধতিতে, শতকরা 96 ভাগ আলুর স্বাদ-পুষ্টিগুণ যে এক বছর পর্যন্ত অটুট থাকে— সোভিয়েত গবেষকদের পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

মস্তিষ্ক বদল

শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত একজনের মাথায় অন্যের মস্তিষ্ক বসানোর উদ্দেশ্যে গবেষণা শুরু করেছেন দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। আপাততঃ বানরের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান যাচ্ছে। ভ্রূণ অবস্থায় বানরশিশুর মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ কেটে নিয়ে তা বসান হচ্ছে সুস্থ বানরদের মস্তিষ্কে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা —যদি অদূর ভবিষ্যতে জন্তু-জানোয়ার এবং মানুষদের ওপর এজাতীয় পরীক্ষা সফল হয় তবে অকেজো মস্তিষ্কের দরুন পক্ষাঘাত ও অন্যান্য উপসর্গের হাত থেকে রোগীদের বাঁচান সম্ভব হবে। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের কোষগুলি একবার ধ্বংস হয়ে গেলে অন্য কোন উপায়ে তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

অমিত চক্রবর্তী

output power এবং input power যথাক্রমে P_2 এবং P_1 হলে মূল বর্তনীর মোট power gain কে db এককে প্রকাশ করলে দাঁড়াবে, $db = 10\log \frac{P_2}{P_1}$ যে কোন ইলেকট্রনিক বা তড়িৎ বর্তনী সাধারণতঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত সমীকরণ মেনে চলে যা হল—

$$db = 10\log \frac{P_2}{P_1} = 10\log \left(\frac{E_1}{E_2}\right)^2 \times \frac{R_2}{R_1} = 20\log \frac{E_1}{E_2} = 20 \log \frac{I_1}{I_2}$$

যেখানে P_2, E_2, R_2 এবং I_2 হল যথাক্রমে output power, output voltage output resistance এবংo utput current আর P_1, E_1. R_1 এবং I_1 হল যথাক্রমে input power, input voltage, input resistance এবং input current।

Noise Figure বা Noise Factor কে যে সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা হল, $NF = \frac{Si / Ni}{So / No}$

যেখানে, NF = noise factor, যার সাধারণতঃ কোন একক থাকে না আবার অনেক সময় decibel এককে প্রকাশ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে NF (in decibels) = 10 log NF ratio।

Si = input signal power in watts.

Ni = input noise power in watts.

So = output signal power in watts.

No = output noise power in watts.

ট্রানজিস্টার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যা না বললেই নয় তা হল—

1) Leakage current ও Saturation current :

দুটোই হল ট্রানজিস্টারের d-c reverse current যখন ট্রানজিস্টারটা reverse bias mode এ কাজ করে এবং ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে এই leakage current সাধারণতঃ যৎসামান্য কিছু microamperes current হয়ে থাকে। Common base circuit এ কোন ট্রানজিস্টারের saturation current কে ICo বা ICBo দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ICBo হল কোন transistor এর collector to Base current at open Emitter। ICBo সাধারণতঃ মোট collector current এর শতকরা 1 ভাগেরও অনেক কম হয়ে থাকে।

এখন common base সার্কিটে current Distribution কে নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

17, যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কল-61

$IC = \alpha IE + ICo$ (বা ICBo)

$IB = IE - \alpha IE - ICo$

যেখানে, IB = base current

IC = collector current

IE = emitter current

ICo = ICBo = saturation current বা leakage current.

α = a transistor constant for common base circuit.

1 Transconductance :

Transconductance কে সাধারণতঃ gm চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং যা হল small change in collector current এবং small change in emitter base voltage এর অনুপাত at constant collector emitter voltage অর্থাৎ $gm = \frac{dic}{dveb}$ (at constant vcc)

যেখানে, gm = small signal transconductance in mhos.

dic = charge in collector current in amp.

dveb = charge in emitter base voltage in volts.

অন্যদিকে কোন transistor এর gain-band width product কে mathematically প্রকাশ করা হয়—

$f_T = \frac{gm}{2\pi Cbc}$ এই সমীকরণ দ্বারা।

যেখানে, f_T = gain-bandwidth product of a trasistor in Hertz.

gm = extrinsic transconductance in mhos.

Cbe = input (base-emitter) capacitance in farads.

এখন কোন Audio frequency transistor এর transconductance এবং input capacitance যথাক্রমে 7,000 μ mhos এবং 44 Pf হলে উক্ত ট্রানজিস্টারে gain bandwidth product বা f_T হবে,

$$f_T = \frac{gm}{2\pi\ bc} = \frac{7000 \times 10^{-6}}{2 \times 3.14 \times 44 \times 10^{-12}}$$

= 25.333 MHz

ইলেকট্রনিকস-এর কলা-কৌশল শীর্ষক রচনাটি পাঁচটি কিস্তিতে প্রকাশিত হল। রচনাটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত দপ্তরে জানাও।

বিচিত্র প্রাণী আর্মাডিলো

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

আর্মাডিলো (Armadillo) এক আজব প্রাণী। কারণ এদের সারা গা বর্ম দ্বারা ঢাকা। স্প্যানিশ ভাষায় আর্মোডো মানে 'বর্ম'। শামুক, কচ্ছপ, অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণী যেমন তাদের নরম দেহকে শক্ত খোলার মধ্যে ঢেকে রাখে, আর্মাডিলোও তার নরম দেহকে ভয় পেলে বর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। এদের বর্ম মাছের আঁশের মত সাজানো কিন্তু অনেক শক্ত ও ধারালো চাকতির মত হাড় দিয়ে গঠিত। তার ওপর শিঙের মত ছোট ছোট কঠিন ধারালো বস্তু দিয়ে ঢাকা। প্রত্যেক চাকতি গায়ের চামড়ার সঙ্গে যেখানে যুক্ত, সেখানটা ইচ্ছেমত সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারে। তাই যখন এরা ভয় পায় তখন কুঁকড়ে একটা গোল বলের মত হয়ে যায়, যাতে মাথা, পেট, পা এবং লেজ সমস্তই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়। আর গোল হয়ে যাবার ফলে গায়ের ধারালো চাকতিগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। তখন কোন শিকারী প্রাণীর আর সাধ্য থাকে না এই জন্তুটার সঙ্গে লড়াই করার। যদি এই চাকতিগুলো কোন জন্তুর গায়ে লেগে যায় তাহলে তার দেহ কেটেকুটে রক্তপাত ঘটাবে। এদের লেজেও কতকগুলি হাড়ের বলয় দেখা যায়। এদের দেহে খুব সামান্য লোমও দেখা যায়।

আর্মাডিলো নামে এই আজব প্রাণীটি 'এডেন্টাটা' (Edentata) বর্গের। এদের দেখতে পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত জায়গার বনে জঙ্গলে। এদের 20 টি প্রজাপতি (Species-র সন্ধান মেলে, তবে এদের বেশির ভাগ প্রজাতি দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। সবচেয়ে বৃহত্তম আর্মাডিলো দেখা যায় যা 3ft লম্বা। তার নাম 'জয়েন্ট আর্মাডিলো'। এবং সবচেয়ে ছোট 'ফেরারী আর্মাডিলো' যা মাত্র ১ ইঞ্চি লম্বা। এরা নিজেরা গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে বাস করে। এই গর্ত থেকে দিনের বেলায় সাধারণতঃ বের হয় না। রাতে এরা গর্ত থেকে বের হয় খাবারের সন্ধানে। এদের প্রধান খাদ্য পিঁপড়া ও উইপোকা। এছাড়া এরা বিভিন্ন উদ্ভিদ, উদ্ভিদের মূল, সাপ এবং অন্যান্য ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ খায়। এদের পা-গুলো ছোট ছোট হলে কী হবে, এরা বেশ দ্রুতগতিতে চলাফেরা করে। এরা জলে সাঁতার কাটতে পারে, তবে শুকনো জায়গা অধিক পছন্দ করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস্, মিশৌরী, কান্সাস প্রভৃতি অঞ্চলে নয় চাকতিযুক্ত (Nine banded) আর্মাডিলো (যাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'ড্যাসিপাস নভেমসিনটাস') বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা এদের বর্ম দিয়ে সুন্দর ঝুড়ি তৈরি করে। এদের সুস্বাদু মাংস তারা খায় এবং এদের চর্বির তেল দিয়ে ওষুধ তৈরি করে।

এদের আঙ্গুলের ও নখের এত জোর নাকি এরা যদি শক্ত মাটিতে নখ বসিয়ে দেয় তাহলে শিকারীরা'ও তাদের গর্ত থেকে টেনে বের করতে হিমশিম খেয়ে যায়। তবে শিকারীরাও তাদের হার মানাবার জন্য একটা কৌশল করে। তারা ঐ সময় তাদের পেটের তলার নরম চামড়ায় কাঠি দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়, ফলে তাদের দেহ প্রসারিত হয়, তাদের নখ বসানো আঙুল শিথিল হয়ে পড়ে এবং তখন তারা তাকে টেনে নিয়ে শিকার করে।

জয়রামপুর, শুকদেবপুর, 24 পরগনা, 743503

জানু-ফেব্রু '88 সংখ্যায় 1988 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও প্রস্তুতিমূলক আলোচনা করবেন অসীম মুখোপাধ্যায়।

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি** ১০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু** ১০৲

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই** ১০৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ** ৮৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা** ১০৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৭

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০৲

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

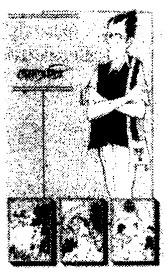

মৌলিক কাহিনী সার
বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে
চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে—
গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে
ঘনাদা কিভাবে সেই
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা
করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫৲

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ **পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা**

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ **কৃতী বিজ্ঞানী**

মেঘনাদ ॥ **বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র**

কৃতী বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

যুগদেবতা রামকৃষ্ণ

পরমাপ্রকৃতি সারদামনি

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

আলোকময়ী শ্রীমা

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫৲

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫

মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২৲

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০৲

ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮৲

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮৲

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮৲

সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮৲

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

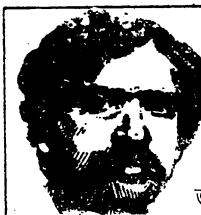

**আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প
প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও
চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন**

জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫৲

কিশোর ক্লাসিক্স্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০৲

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **ছোটদের কাজল** ১০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫৲

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০৲

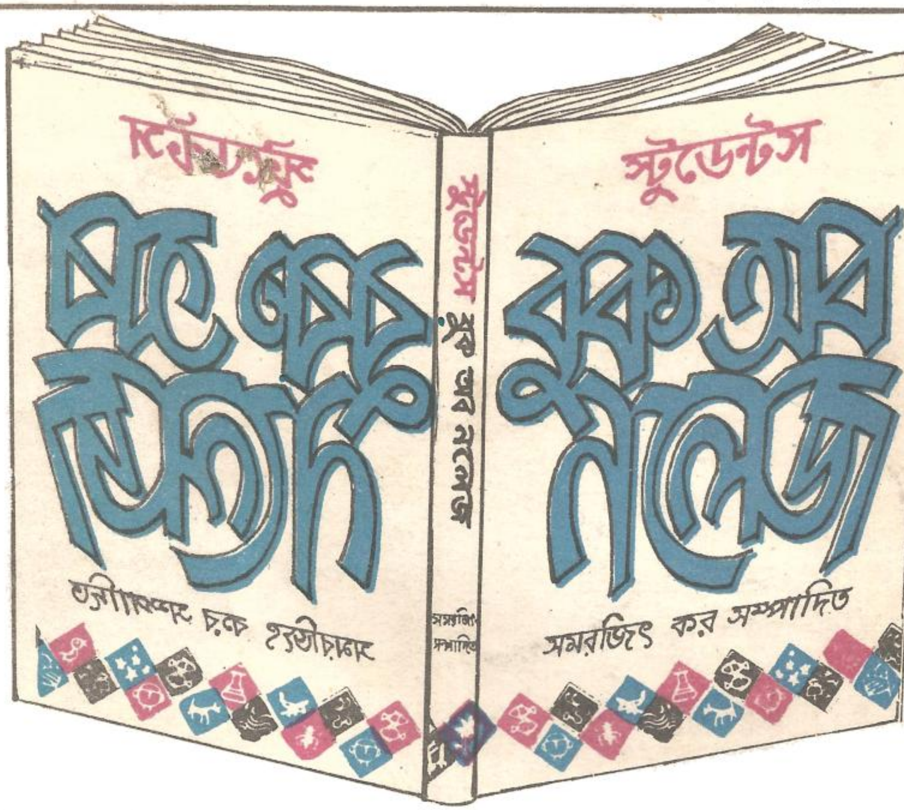

দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

অণু' শব্দের অর্থ কি ? পরমাণুই বা কাকে বলে ? আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অজানা নয় । কিন্তু অক্টেন স শব্দটির অর্থ আমরা সবাই জানি কি ? ভিনিগার নানারকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয় । কিন্তু ভিনিগার যে একরকমের অ্যাসিড এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা । ম্যাগ্রোমিটার ও ম্যানোমিটার শব্দদুটি আজকাল আমরা প্রায়ই শুনতে পাই । কিন্তু শব্দদুটির সঠিক ব্যবহার কি ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অনেক শব্দ আমরা শুনতে পাই—যার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানি না । এইরকম প্রায় ২৫০০ শব্দের চিত্রসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক অমরনাথ রায় । যে গ্রন্থ শুধু কিশোর কিশোরীদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকেরও কৌতুহল মেটাবে । পঁচিশ টাকা

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায় সঙ্কলিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

আপনার ছেলেমেয়েদের আরও জানার কৌতূহল মেটাবে

একখণ্ডে সম্পূর্ণ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

পঞ্চাশ টাকা

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য — শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

দাম : 4·00 টাকা ।